Vol. 1 | No. 1 | 1957

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলার ব্যঞ্জনধ্বনি

Volume	1
Issue	1
Year	1957
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুহম্মদ আবদুল হাই
Published online	June 15, 1957
DOI	10.62328/sp.v1i1.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v1i1.2
Pages	৫-৩২
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলার ব্যঞ্জনধ্বনি

Check for updates

মুহম্মদ আবদুল হাই

সাহিত্য পত্রিকা
Shahitto Potrika

Online ISSN 3006-886X
ISSN 0558-1583
Volume 1
Number 1
Year 1957

সাহিত্য পত্রিকা: বর্ষা ১৩৬৪ (১৯৫৭)
বর্ষ: ১ সংখ্যা: ১ পৃষ্ঠা: ৫-৩৭

DOI 10.62328/sp.v1i1.2

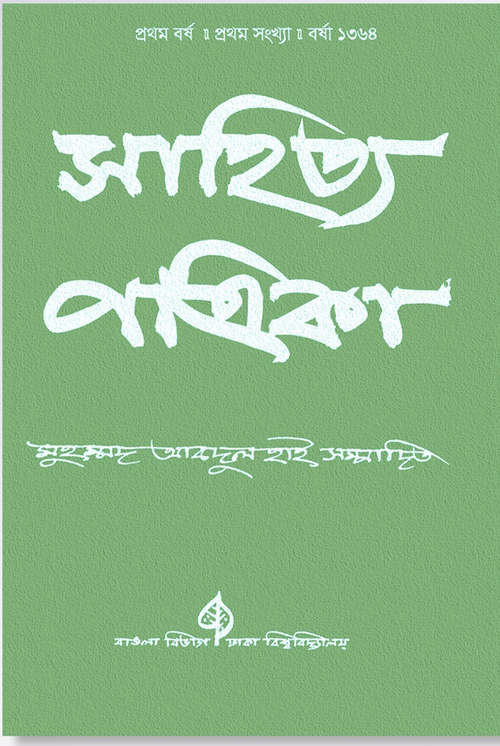

সাহিত্য পত্রিকা
বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

।। বাংলার ব্যঞ্জনধ্বনি ।।

মুহম্মদ আবদুল হাই

এক

যে-কোন ভাষার বাগ্‌ধ্বনিই অর্থবোধক ধ্বনি। ধ্বনি অর্থহীনও হতে পারে, কিন্তু তা কোন ভাষার অন্তর্ভুক্ত নয়। যে-কোনো ভাষার বাগ্‌ধ্বনিগুলোর মধ্যে স্বরধ্বনির বিপরীত ধ্বনিই ব্যঞ্জনধ্বনি। স্বাভাবিক কথাবার্তায় গলনালী ও মুখবিবর দিয়ে বাতাস বেরিয়ে যাবার সময় কোনো জায়গায় বাধা না পেয়ে কিংবা শ্রুতিগ্রাহ্য চাপা না খেয়ে যে ঘোষধ্বনি উদ্‌গত হয় তা-ই স্বরধ্বনি। এ থেকে বোঝা যায় যে-সব ধ্বনি এ সংজ্ঞাভুক্ত নয় স্বাভাবিক কথাবার্তায় সেগুলোই ব্যঞ্জনধ্বনি। অর্থাৎ স্বাভাবিক পদ্ধতিতে কথাবার্তা বলার সময়ে ফুস্‌ফুস্‌-নির্গত বাতাস গলনালী, মুখবিবর কিংবা মুখের বাইরে (ঠোঁটে) বাধা পাওয়ার কিংবা শ্রুতিগ্রাহ্য চাপা খাওয়ার ফলে যে-সব ধ্বনি উদ্‌গত হয় সেগুলোই ব্যঞ্জনধ্বনি।

এ সংজ্ঞার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে (১) যাবতীয় অঘোষ ধ্বনি (যেমন ক, চ, স), (২) বায়ুপথ রুদ্ধ হওয়ার জন্যে যত ধ্বনি উত্থিত হয় (যেমন গ, ট, ব, ল), (৩) যে-সব ধ্বনি উচ্চারণে বাতাস মুখবিবর দিয়ে না বিরিয়ে নাসাপথে বেরোয় (যেমন, ম, ন, ঙ) এবং (৪) শ্রুতিগ্রাহ্য ঘষা লেগে যে-সব ধ্বনি উৎপন্ন হয় (যেমন শ, স,) এদের সবগুলিই ব্যঞ্জনধ্বনি।

ধ্বনি উৎপাদনের দিক থেকে স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির পার্থক্য নিতান্ত 'arbitrary' বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয়, এ পার্থক্য 'acoustics' বা শ্রুতির দিক থেকেই সহজ-বোধ্য। ধ্বনি বিচারে এবং ধ্বনির মর্মগ্রহণে মানুষের কানের মতো উপযোগী আর কোনো যন্ত্র নেই। ধ্বনির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাগ কিংবা বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির জন্যে কান যদি তৈরী থাকে তা হ'লে্‌ এক ধ্বনি থেকে অন্য ধ্বনির দ্যোতনাগত পার্থক্য মানুষের কাছে সহজবোধ্য হ'য়ে ওঠে। তখনই বোঝা যায় স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির সংজ্ঞাগত পার্থক্য তাদের অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনাকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে।

উচ্চারণ কালে দেখা যায়, ধ্বনির দৈর্ঘ্য (length), শ্বাসাঘাত (stress accent) কি স্বরাঘাত (pitch-accent)-জনিত প্রাধান্য কিংবা উচ্চারণ ভংগীর উঁচু নীচু অবস্থানের দিক থেকে বাক্য কি শব্দের ভেতরের এক ধ্বনি অন্য ধ্বনির তুলনায়

অপেক্ষাকৃত বেশী ব্যঞ্জনাময়, কিন্তু বাক্যের ভেতরে উচ্চারণ না ক'রে স্বর ও ব্যঞ্জনের প্রত্যেকটি ধ্বনিকে কণ্ঠভংগীর একই অবস্থায় উচ্চারণ করলে দেখা যাবে একটি ধ্বনির প্রাণশক্তি অন্যধ্বনির প্রাণশক্তির তুলনায় অনেক কম কিংবা বেশী। সেদিক থেকে বাধাহীন ধ্বনি ব'লে যে-কোনো স্বরধ্বনি ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় অনেক প্রাণময়, তার দ্যোতনা এবং ব্যঞ্জনাও স্বাভাবিকভাবেই অনুরণনশীল। শুধু তাই নয়, স্বরধ্বনিগুলোর মধ্যেও বিবৃত (open) স্বরধ্বনি সংবৃত (close) স্বরধ্বনির তুলনায় অধিক প্রাণময়, ঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনি অঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় অধিক শ্রুতিব্যঞ্জক, এমনকি ঘোষ ব্যঞ্জন-ধ্বনির মধ্যে পার্শ্বিক ধ্বনি (ল) এবং নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি (ন, ম, ঙ), অন্যান্য ঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনির চেয়ে অনেক বেশী ব্যঞ্জনাময়। ঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনির সংগে তুলনায় অঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনির প্রাণশক্তি (carrying power) অত্যন্ত অল্প এবং ভাষাতাত্ত্বিক প্রয়োজনের দিক থেকে এক অঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনির সংগে অন্য অঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যঞ্জনাগত পার্থক্য একরকম নেই বল্‌লেই চলে। ধ্বনির ব্যাপারে বিশ্লিষ্ট ভাবে ধ্বনি উচ্চারণের স্বাভাবিকত্বই বিচারের মাপকাঠি হওয়া উচিত, কেননা একথা সত্য যে, বাক্যের ভেতরের ধ্বনি-তরঙ্গের মধ্যে যে-কোনো ধ্বনিই যে-কোনো ধ্বনির চেয়ে বেশী প্রাণময় হ'তে পারে। সে ক্ষেত্রে যে-কোনো একটি অঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনি অন্য অঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় প্রাণশক্তির দিক থেকে গুরুত্ব বা প্রাধান্যও লাভ করতে পারে ; এমনকি বাক্যের মধ্যে ব্যবহার না করেও ইচ্ছা করলেই একটি অঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনিকে অন্য একটি অঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায়ও বেশী ক'রে জোর দিয়ে দীর্ঘ ক'রে, এক-কথায় দ্যোতনা দিয়ে উচ্চারণ করা যায়। কিন্তু বিভিন্নভাবে এক একটি ধ্বনিকে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে উচ্চারণ করতে গেলেই দেখা যাবে স্বরধ্বনি ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় অনেক বেশী প্রাণময়—দ্যোতনাময় এবং তার ঝঙ্কারও ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় বেশী দূর থেকে শোনা যায়। এ কারণেও বাগ্‌ধ্বনির সবগুলিই ধ্বনির দুই মূল বিভাগ স্বর ও ব্যঞ্জন পর্যায়ে ভাগ হয়ে যায়।

জিভের স্থান, জিভের উচ্চতার পরিমাণ এবং ঠোঁটের অবস্থানের দিক থেকে যেমন স্বরধ্বনির বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা যায়, ব্যঞ্জনধ্বনি চিহ্নিত করার এবং একটি থেকে অন্যটির পার্থক্য সূচিত করারও তেমনি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া রয়েছে। চারটি কি পাঁচটি প্রক্রিয়ার সাহায্যে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর মধ্যেকার মোটামুটি একটা শৃঙ্খলা

আবিষ্কার করা যায়। প্রক্রিয়াগুলো যথাক্রমে ঃ—(ক) উচ্চারণের স্থান, (খ) উচ্চারণের স্থানে বায়ুপথের রূপ, (গ) তালুর নরম অংশ বা কোমল তালুর অবস্থা {(ক) এবং (খ)-এর মধ্যে যদি তার উল্লেখ না থাকে}, (ঘ) স্বরযন্ত্রের অবস্থা {(ক) কিংবা (খ)-এর মধ্যে যদি তার উল্লেখ না করা হয়} এবং (ঙ) স্বল্পপ্রাণতা এবং মহাপ্রাণতার বিচার ক'রে।

প্রথম পদ্ধতি বা উচ্চারণের স্থান অনুসারে চলতি বাংলা (আঞ্চলিক নয়) ব্যঞ্জন-ধ্বনিগুলোকে এভাবে সাজানো যায় ঃ—

(১) কণ্ঠ্য বা গলনালীয় (glottal বা laryngeal) ; যথা ঃ 'হ'।

(২) জিহ্বামূলীয়, পশ্চাত্তালুজাত বা কোমলতালুজাত (velar) ; যথা ঃ 'ক', 'খ', 'গ', 'ঘ', 'ঙ',

(৩) প্রশস্ত দন্তমূলীয় (dorso-alveolar) ; যথা ঃ 'চ', 'ছ', 'জ', 'ঝ',

(৪) পশ্চাৎ দন্তমূলীয় (Post alveolar) যথা ঃ 'শ'

(৫) দন্তমূলীয় মূর্ধন্য বা দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত (alveolo-retroflex) যথা ঃ 'ট', 'ঠ', 'ড', 'ঢ', 'ড়', 'ঢ়'

(৬) দন্তমূলীয় (alveolar) ; যথা ঃ 'র', 'ল', 'স', 'য' (z), 'ন', 'হ্ন', 'হল' হ্র'

(৭) দন্ত্য (dental) ; যথা ঃ 'ত', 'থ', 'দ', 'ধ'

(৮) ওষ্ঠ্য (labial) ; যথা ঃ 'প' 'ফ' (ph) 'ব' (b) 'ভ', (bh) 'ম' 'হ্ম', অন্তঃস্থ 'ব' = 'ওয়া' = 'w' (oy)

(৯) দন্তৌষ্ঠ (labio-dental), যথা ঃ 'ফ' (f) 'ভ' (v)

উচ্চারণ স্থান অনুসারে ধ্বনির উদ্ধৃত নামগুলোর এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় ঃ—

কণ্ঠ্য বা গলনালীয় ঃ স্বরযন্ত্র (larynx)-এর মধ্যে ঠোঁটের (vocal lips) মতো যে দু'টো তন্ত্রী (vocal cords) আছে তাদের সংকোচনের সাহায্যে বায়ুপথ সংকীর্ণ করে, কিন্তু একেবারে বন্ধ না ক'রে যে ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়।

জিহ্বামূলীয়, পশ্চাত্তালুজাত বা কোমল তালুজাত (velar) ঃ—

জিভের মূল বা গোড়ালী উঁচু ক'রে কোমলতালুর সামনের কি মাঝের সংগে লাগিয়ে যে ধ্বনির উচ্চারণ করা হয়।

প্রশস্ত দন্তমূলীয় (dorso-alveolar) ঃ—

জিভের পাতার (blade) তু'পাশ চ্যাপ্টা ও চওড়া ক'রে উপর পাটি দাঁতের মাড়ি (teeth ridge) ও শক্ততালুর অগ্রভাগ ও তু'পাশকে স্পর্শ করে যে ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়।

পশ্চাৎ দন্তমূলীয় (post-alveolar) ঃ—দাঁতের গোড়ার শেষাংশ ও শক্ততালুর আরম্ভের স্থানে জিভের পাতা উঁচু করে যে ধ্বনি পাওয়া যায়।

দন্তমূলীয় মূর্ধন্য বা দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত ঃ—(alveolo-retroflex) উপর পাটি দাঁতের গোড়া (teeth ridge)-এর সংগে জিভের ডগা একটু উল্টো করে লাগিয়ে যে ধ্বনি পাওয়া যায়। ইংরেজিতে জিভের এ অবস্থাকে বলা হয় 'curling up of the tip of the tongue,' জিভের ডগা উল্‌টিয়ে দন্তমূলের সংগে লাগানোর ফলে উদ্ভূত ধ্বনিটির ব্যঞ্জনা নিছক দন্তমূলোত্থিত ধ্বনির মতো সুস্পষ্ট হয় না, হয় আড়ষ্ট ও প্রতিবেষ্টিত।

দন্তমূলীয় (alveolar) ঃ—উপর পাটি দাঁতের গোড়া সংলগ্ন মাড়ি, তথা দন্ত-মূলের সংগে জিভের ডগা লাগিয়ে যে ধ্বনি করা হয়।

দন্ত্য (dental) ঃ—উপর পাটির দাঁতের সংগে জিভের ডগা লাগিয়ে যে ধ্বনি করা হয়।

ওষ্ঠ্য (labial) ঃ—তু' ঠোঁটের সংস্পর্শে যে ধ্বনি করা হয়।

দন্তৌষ্ঠ্য (labio-dental) ঃ—নীচের ঠোঁট উপর পাটির দাঁতের দিকে উঁচু ক'রে যে ধ্বনি পাওয়া যায়।

(খ) দ্বিতীয় পদ্ধতি অর্থাৎ উচ্চারণের স্থানে বায়ুপথের রূপ তথা উচ্চারণের রীতি অনুসারে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে এভাবে সাজানো যায় ঃ—

(১) স্পর্শ বা স্পৃষ্ট (plosive) ঃ—

অঘোষ অল্পপ্রাণ ঃ—'ক', 'চ', 'ট', 'ত', 'প', (k, c, ṭ, t, p)

অঘোষ মহাপ্রাণ ঃ—'খ', 'ছ', 'ঠ', 'থ', 'ফ', (kh, ch, ṭh, th, ph)

ঘোষ অল্পপ্রাণ ঃ—'গ', 'জ', 'ড', 'দ', 'ব' (g, j, ḍ, d, b)

ঘোষ মহাপ্রাণ ঃ—'ঘ', 'ঝ', 'ঢ', 'ধ', 'ভ' (gh, jh, ḍh, dh, bh)

(২) ঘর্ষণজাত বা ঘৃষ্ট (Affricate) ঃ—

অঘোষ অল্পপ্রাণ 'চ' (ts)

অঘোষ মহাপ্রাণ 'ছ' (tsh)

ঘোষ অল্পপ্রাণ 'জ' (dz)

ঘোষ মহাপ্রাণ 'ঝ' (dzh)

(৩) নাসিক্য (nasal) ঃ—'ঙ', 'ন', 'হ্ন', 'ম', 'হ্ম',

ঘোষ স্বল্পপ্রাণ—'ঙ', 'ন', 'ম'

ঘোষ মহাপ্রাণ—'হ্ন' (ন্হ), হ্ম (ম্হ)

(৪) পার্শ্বিক (lateral) ঃ—ঘোষ স্বল্পপ্রাণ কিংবা তরল (liquid) 'ল',

ঘোষ মহাপ্রাণ 'হল' (ল্হ)

(৫) কম্পনজাত (trill) ঃ—ঘোষ স্বল্পপ্রাণ কিংবা তরল (liquid) 'র',

ঘোষ মহাপ্রাণ 'হ্র' (র্হ)

(৬) তাড়ন-জাত (flapped) ঃ—অল্পপ্রাণ ঘোষ 'ড়',

মহাপ্রাণ ঘোষ 'ঢ়'

(৭) শ্বাসজাত বা উষ্ম (তথা শিসধ্বনি) (fricative) ঃ—

দন্তমূলীয় কি অগ্রদন্তমূলীয় অঘোষ 'স',

দন্তমূলীয় ঘোষ— 'য' (z)

দন্তৌষ্ঠ্য অল্পপ্রাণ অঘোষ—'ফ' (f),

দন্ত্যৌষ্ঠ মহাপ্রাণ ঘোষ—'ভ' (v)

ওষ্ঠ্য ঘোষ অল্পপ্রাণ—'ব' = 'ওয়' (w) (oy)

* কণ্ঠ্য বা গলনালীয় ঘোষ—'হ' (h)

কণ্ঠ্য বা গলনালীয় অঘোষ ঃ (ḥ) (বিসর্গ)

* উষ্মধ্বনির পর্যায়ে না ফেলে 'হ' কে স্পর্শহীন কণ্ঠ্য ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনিও (voiced aspirate without stop) বলা যায়।

(৮) অর্ধ-স্বর (ব্যঞ্জন বিভাগে consonantal vowel হিসেবে)—'য়', 'ওয়' (y, w) যেমন—যায় (jay), শোয় (soy) শব্দের 'সিলিবল্'কে 'closed syllable' হিসেবে আটকে রাখার জন্যে।

(খ) উচ্চারণের স্থানে বায়ু পথের রূপ তথা উচ্চারণ রীতি অনুসারে উদ্ধৃত সংজ্ঞাগুলোরও এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় ঃ—

স্পর্শ বা স্পৃষ্টধ্বনি ঃ—উচ্চারণের স্থানে বায়ুপথ কিছুক্ষণের জন্য সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হয়ে যায় ; যে প্রত্যঙ্গগুলো উচ্চারণে অংশ গ্রহণ করে ফুস্‌ফুস্‌-আগত বাতাস তার পেছনে এসে জমা হয় এবং মুহূর্তকাল পরেই অংশগ্রহণকারী প্রত্যঙ্গ হু'টোকে পৃথক ক'রে দিয়ে সজোরে বে'র হয়ে যায়। বাতাস বে'র হওয়ার সময় হু'ঠোঁট কিংবা তালু ও জিভের যে অংশ এ ধরণের বিশেষধ্বনি উচ্চারণে অংশ গ্রহণ করে, ফুস্‌ফুস্‌ চালিত বাতাস পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে এ হু'টোকে সজোরে পৃথক ক'রে দেয় ব'লে ফট্‌কার মতো ধ্বনি হয় ; (উদাহরণ 'ক', 'ট', 'ত', 'প')। স্পর্শধ্বনির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে তার প্রত্যেকটির মধ্যে তিনটি পর্যায়ের পরিচয় পাওয়া যায় ঃ—(১) ধ্বনি সংগঠনের জন্য উচ্চারণ স্থান হু'টির সংস্পর্শ (২) সংস্পৃষ্ট অবস্থায় উচ্চারণ স্থান হু'টির কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান। (এ অবস্থান অবশ্য হু'পাঁচ মিনিট নয়, এক সেকেণ্ডের শতাংশের হু'চার অংশ কিংবা সামান্যতম ক্ষণের যে সময়টুকুতে উচ্চারক এবং শ্রোতার মনে এ অবস্থান বোধ জন্মে) (৩) উচ্চারণ স্থান হু'টো পৃথক হয়ে বাতাস বেরিয়ে যাওয়া।

বাংলার ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে স্পর্শধ্বনিই সংখ্যাগরিষ্ঠ, বিশটি কিংবা মতান্তরে ষোলটি। এ মতান্তর 'চ' বর্গের ধ্বনিগুলোকে নিয়ে। এ সম্পর্কে আমি যথাস্থানে আলোচনা করবো।

ঘৃষ্ট বা ঘর্ষণজাত ধ্বনি ঃ—(Affricates) এক রকম স্পর্শধ্বনিই কিন্তু উচ্চারক হু'টো (জিভ এবং দন্তমূলের যে অংশে এ ধ্বনি উচ্চারিত হয়) পৃথক হওয়ার সময় স্পর্শধ্বনির ফট্‌কার মতো আওয়াজ শোনা যায় না ; উচ্চারক অংশ হু'টি স্পর্শ ধ্বনির তুলনায় অপেক্ষাকৃত ধীরে পৃথক হওয়ার জন্যে উক্ত স্থানে কিছু ঘষা লেগে যায় (ইংরেজীতে এ অবস্থাকে বলা হয় 'Plosive followed by corresponding friction')।

উচ্চারকদের ধাক্কা দিয়ে বেরোতে গিয়ে ফুস্‌ফুস্‌-তাড়িত বাতাস উক্ত অংশ হু'টোকে আল্‌গা করার পরেই তাদের কাছে চাপা খেয়ে যায়, ফলে যে ধ্বনি ওঠে তা স্পর্শধ্বনির মতো ফুস্‌ফুস্‌-তাড়িত বাতাসের এক ধাক্কায় বেরুনো অত্যন্ত সুস্পষ্ট

ধ্বনি নয়। এ ধ্বনি বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, স্পর্শধ্বনির মধ্যে যে তিনটি পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে এতে তার চেয়ে বেশী আর একটি পর্যায় আছে। তা উচ্চারক স্থান দু'টোকে আলগা করে বাতাস বেরিয়ে যাওয়ার সময় তাদের কাছেই একটু ঘষা খেয়ে যাওয়া। উদাহরণ ঢাকার কুট্টিদের চ বর্গের ধ্বনি 'চ', 'ছ', 'জ', 'ঝ', ('ts', 'tsh', 'dz', 'dzh')।

নাসিক্য ধ্বনি (nasal) :—সাধারণ স্পর্শধ্বনির মতোই মুখবিবর কিংবা ঠোঁট বদ্ধ হয়ে এ ধ্বনি উত্থিত হয়, উচ্চারকেরা (articulators) পরস্পর সংস্পর্শ লাভ করে, কিন্তু সংগে সংগে কোমল তালু নীচের দিকে নেমে আসায় নাসাপথ (naso-pharynx) মুক্ত হয় দেখে ফুস্‌ফুস্-তাড়িত বাতাস মুখ দিয়ে না বের হ'য়ে নাক দিয়ে বের হয়। উচ্চারকেরা পৃথক হবার আগেই বাতাস নাক দিয়ে বের হ'য়ে যায়। কোমল তালু নীচের দিকে নেমে পড়ায় নাসাপথ (naso-pharynx) উন্মুক্ত হয় ব'লে মুখবিবর কিংবা ঠোঁট রুদ্ধ থাকা অবস্থাতে এ ধ্বনিকে ইচ্ছামতো প্রলম্বিতও করা যায়। অন্যান্য স্পর্শধ্বনির সংগে নাসিক্য ধ্বনির তফাৎ এখানেই। এজন্যে নাসিক্য ধ্বনিগুলোকে continuant বা প্রলম্বিত ধ্বনি বলা হয়ে থাকে। উদাহরণ 'ঙ', 'ন্', 'ম্' ; এদের প্রত্যেকটিরই উচ্চারণের জায়গায় উচ্চারকদের (articulators) মুক্ত না ক'রে যুক্ত রেখেই নাসাপথে শ্বাস যতক্ষণ নিঃশেষিত না হয় ততক্ষণ এ ধ্বনিকে ধরে রাখা যায়। সাধারণ স্পর্শধ্বনির যে তিনটি পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে—যেমন (১) মুখবিবরে কিংবা মুখের বাইরে (ঠোঁটে) ধ্বনি সংগঠন, (২) কিছুক্ষণের জন্যে তদবস্থায় উচ্চারকদের অবস্থান এবং (৩) ফটকার মতো ধ্বনি ক'রে তাদের দ্রুত পৃথকীকরণ—এ তিনটির প্রথম দু'টো নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু স্পর্শধ্বনির সব চেয়ে বড় শর্ত উক্ত তৃতীয় পর্যায়টি নাসিক্য ধ্বনিতে থাকে না। তার পরিবর্তে কোমল তালু ঝুলে পড়ার জন্যে নাসাপথ উন্মুক্ত থাকায় ফুস্‌ফুস্-তাড়িত বাতাস অত্যন্ত সহজ ভাবেই সেখান দিয়ে ধীরে ধীরে বেরোতে পারে। এ জন্যে 'ক' থেকে 'ম' পর্যন্ত এ পচিশটি ধ্বনিকে প্রাচীন বৈয়াকরণরা যেভাবে স্পর্শধ্বনির অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, আধুনিক ধ্বনিতত্ত্বের সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক বিচারে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে তাঁদের সেভাগে ফেলা যায় না। নাসিক্য ধ্বনিগুলোতে স্পর্শধ্বনির বৈশিষ্ট্য যতটুকু আছে, ব্যতিক্রম আছে তার চেয়ে অনেক বেশী। এবং এ ব্যতিক্রমের জোরেই নাসিক্য ধ্বনি যত না স্পর্শ-ধ্বনি তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে প্রলম্বিত (continuant) ধ্বনি।

এ প্রসঙ্গে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি (nasal consonants) এবং সানুনাসিক স্বর-ধ্বনির (nasalized vowels) মধ্যে যে তফাৎ আছে সাধারণের অবগতির জন্য তারও আলোচনা উল্লেখযোগ্য ব'লে মনে করি। স্বর এবং ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে যে তফাৎ, 'অনুনাসিক' বা 'সানুনাসিক' এবং 'নাসিক্য'—এ সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে সে ধরণের তফাৎ করা বিধেয়।

ধ্বনি বিজ্ঞানে সংজ্ঞা বা 'term' এর গোলযোগে ধ্বনিরও গোলযোগ হতে দেখা যায়; এবং শিক্ষার্থীরাই শুধু নন, শিক্ষকেরাও নিজেরা যেমন বিপদে পড়েন, তেমনি শিক্ষার্থীদেরও গোলযোগজনিত বিপদ থেকে অব্যহতি দিতে পারেন না। এজন্যে 'অনুনাসিক' কি 'সানুনাসিক' নাম দু'টো স্বরধ্বনির জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখে ব্যঞ্জনের ব্যাপারে 'নাসিক্য' নামটি অবলম্বন করা আমি শ্রেয় বলে মনে করি। আর যদি 'অনুনাসিক' কিংবা সানুনাসিক' নাম দিয়ে ব্যঞ্জন এবং স্বর সবই কেউ বোঝাতে চান, তা'হলে যথাক্রমে 'অনুনাসিক' কি 'সানুনাসিক' ব্যঞ্জন এবং 'অনুনাসিক' কি 'সানু-নাসিক স্বরধ্বনি উল্লেখ করিতে বলি; তা না হ'লে নামের অরাজকতার জন্যে গোল-যোগের অন্ত থাকবে না।

আগেই বলেছি স্বরধ্বনি গলনালী এবং মুখবিবরের কোথাও বাধা না পেয়ে এবং শ্রুতিগ্রাহ্য চাপা না খেয়ে উচ্চারিত হয়; এর উল্টোটা হলেই হয় ব্যঞ্জনধ্বনি। নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিতেও তাই দেখা যায় মুখবিবরের বিভিন্ন স্থানে এবং ঠোঁটে বায়ুপথ রুদ্ধ হয়ে তাদের উচ্চারিত হ'তে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য কোমল তালু ঝুলে পড়ে অর্থাৎ মানুষ নির্বাক অবস্থায় থাকলে, ঘুমুলে কিংবা মুখ বন্ধ রেখে ধ্বনি উচ্চারক অংশ গুলোকে বিশ্রাম দিলে কোমল তালুকে যে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে দেখা যায়, নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির বেলায় কোমল তালু সে অবস্থায় থাকে। সেজন্যে নিঃশ্বাস ছাড়ার সময় স্বাভাবিকভাবে নাসাপথে যে বাতাস বেরোয় নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের বেলায় ঠিক তেমনটি হয়। নাসিক্য ছাড়া অন্যান্য ব্যঞ্জন কি স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখবিবরে নানারূপ সক্রিয় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, বিশ্রামাবস্থার কোমল তালুর স্বাভাবিক রূপ স্বাভাবিক ঝুলে পড়া অবস্থায় না থেকে উপরে উঠে গিয়ে নাকের ছিদ্র-পথ বা নাসামুখের গহ্বর বন্ধ করে দেয়। তাতে বাতাস আর নাক দিয়ে বেরোতে পারে না, মুখ দিয়ে বেরোয়। সাধারণ স্বরধ্বনি অর্থাৎ মৌখিক স্বরধ্বনি

(oral vowel) উচ্চারণের সময়ও কোমল তালুর অবস্থা থাকে এ রকমই। কিন্তু সানুনাসিক স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় কোমল তালু না-উঁচু না-নীচু এমন মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে ব'লে নাসাপথ যেমন কিছুটা খোলা থাকে মুখ-পথও থাকে তেমনি আলৃগা। এ কারণেই সানুনাসিক স্বরধ্বনি উচ্চারণে মুখ ও নাকের মিলিত দ্যোতনা শোনা যায়; যা মৌখিক স্বরধ্বনিতে শোনা তো দূরের কথা, নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিতেও শোনা যায় না। কেননা নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে প্রয়োজনমতো মুখের কোনো অংশে কিংবা ঠোঁটে উচ্চারকেরা (articulators) মিলিত হয়ে বায়ুপথ রুদ্ধ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে কোমলতালু ঝুলে পড়ার জন্যে নাসাপথ আলৃগা থাকে দেখে ফুস্‌ফুস্-তাড়িত বাতাস শুধু নাক দিয়েই বের হয়, কোনো অবস্থাতেই মুখ দিয়েবের হয় না। এ বর্ণনা যে কত সত্য, তা ভালো বোঝা যায় সর্দিতে দু'টো কিংবা একটা নাক-বন্ধ অবস্থায় কথা বলতে গেলে কিংবা ধ্বনি পরীক্ষার জন্যে নাক চেপে ধরে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করতে গেলে। এ ছাড়া বাংলার সব ক'টি স্বরধ্বনিই অনুনাসিক কি সানুনাসিক ক'রে উচ্চারণ করা যেতে পারে অথচ নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি বাংলা হরফে ছ'টি থাকলেও (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, ং) বাংলার ধ্বনিতে মাত্র এ তিনটি :— 'ঙ', 'ন', 'ম'। অনুনাসিক স্বরধ্বনি লেখা হয় স্বরধ্বনির উপরে চন্দ্রবিন্দু (ঁ) দিয়ে। চন্দ্রবিন্দু নাক ও মুখের মিলিত দ্যোতনায় উচ্চারিত অনুনাসিক স্বরধ্বনি জ্ঞাপক চিহ্ন মাত্র, স্বতন্ত্র ধ্বনি পরিজ্ঞাপক হরফ নয়। তা যে নয়, তার বড় প্রমাণ চন্দ্রবিন্দুর স্বতন্ত্র কোনো উচ্চারণ নেই। ধ্বনির যথারীতি বৈশিষ্ট্য নিরূপণে চন্দ্রবিন্দু হরফ— অতিরিক্ত চিহ্ন (diacritical mark) কিংবা ধ্বনির সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য নিরূপক (prosodic mark) চিহ্ন মাত্র।

পার্শ্বিক ধ্বনি (lateral sound) :—মুখের সামনে থেকে পেছনে কিংবা পেছন থেকে সামনে হিসেব করে মুখবিবরকে ভাগ না করে দু' পাশ থেকে মুখবিবরকে ভাগ করে তার ঠিক মাঝখানে বাতাসের গতিপথ ব্যাহত করে এ ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়। ফুস্‌ফুস্-তাড়িত বাতাস সম্পূর্ণ মুখবিবর ধরে বেরোতে গিয়ে frontal incisor বা সামনের বড়ো দু' দাঁতের মাঝ-বরাবর উপর পাটি দাঁতের মাড়ির সংগে জিভের পাতার সংস্পর্শের জন্যে সেখানে ব্যাহত হয় এবং জিভও দুই কি এক চোয়ালের মধ্যে ফাঁক থাকার জন্যে কমবেশী দু'পাশ কিংবা একপাশ দিয়ে বের হয়ে যায়। এভাবে

ধ্বনিটি পার্শ্বোত্থিত বা পার্শ্বজাত হয় ব'লে উক্ত ধ্বনিকে পার্শ্বিক ধ্বনি বলা হয়— উদাহরণ 'ল'। 'ল' তরল ধ্বনি নামেও পরিচিত।

কম্পনজাত ধ্বনি (trilled sound) ঃ—ফুস্‌ফুস্‌-তাড়িত বাতাস মুখবিবর দিয়ে বেরুবার সময় নড়ন-ক্ষম কোনো প্রত্যঙ্গের (জিভের কোনো অংশের কিংবা আলা জিভের) দ্রুত ও ঘন ঘন কাঁপন লেগে যে ধ্বনি উত্থিত হয়। উদাহরণ, বাংলা 'র', উচ্চারণ 'র্‌' কিংবা 'র্‌র্‌' ; জার্মান ও ফরাসী আলাজিভের কাঁপুনিজাত 'র' 'র্‌র্‌র্‌'। এ ধরণের গঠিত ধ্বনিকে তরল ধ্বনিও বলা হয়।

তাড়নজাত ধ্বনি (flapped sound) ঃ—মুখবিবরের মধ্যে বায়ুপথ রোধ করবার জন্যে নড়ন-ক্ষম কোনো প্রত্যঙ্গের অর্থাৎ জিভের ডগার সামান্যতম স্পর্শে যে ধ্বনি ওঠে। উপর পাটি দাঁতের গোড়ায় (teeth ridge) জিভের ডগার উল্টোপিঠের স্বল্প-স্থায়ী সংস্পর্শজাত ধ্বনি। যেমন 'ড়', 'ঢ়'।

উষ্ম তথা শিশ্‌ধ্বনি বা শ্বাসজাত ধ্বনি (fricative sound)ঃ—উষ্ম অর্থ নিঃশ্বাস। ফুস্‌ফুস্‌ থেকে নিঃশ্বাস বা শ্বাসবায়ু বেরিয়ে যাবার সময় গলনালী থেকে ঠোঁট পর্যন্ত মুখবিবরের নানা জায়গায় বায়ুপথ সংকীর্ণ হয়ে ঘষা লাগতে কিংবা চাপা খেতে পারে; ফলে এ ধরণের ঘর্ষণজাত এক রকম শিসধ্বনি শোনা যায়। সাপের কিংবা ট্রেনের শ্বাস ছাড়ার মতো এ শিসধ্বনিই উষ্মধ্বনি। ইংরেজী 'hissing sound' এর সঙ্গে এর তুলনা করা যায়। আগেকালের ভাষাতত্ত্ব মতে এ ধ্বনিকে নিঃশ্বাস-আশ্রয়ী 'spirant' বা শিশ্‌ধ্বনি 'sibilant' বলা হতো, ঘর্ষণজাত ব'লে হাল আমলের ধ্বনি ও ভাষা-তাত্ত্বিকেরা এর নামকরণ করেছেন 'fricative sound',। ঘর্ষণজাত শ্বাস থেকে শিশ্‌-ধ্বনির উৎপত্তি বলে এ ধ্বনিকে ধরে রাখা কিংবা প্রলম্বিত করা সহজ হয়। উষ্ম বা শিশ্‌ধ্বনির উদাহরণ ঃ— বাংলা 'শ', 'স', 'ফ' (f), ভ (v) ; ইংরেজী 'th' 'f', 'v', 's', 'z' ইত্যাদি ; আরবী 'ز', 'س', 'ش', 'ص', 'ظ', 'ث', 'ذ', 'ع'. 'غ', 'ف', 'ه', 'ح' এবং বাংলা 'হ্‌'। বাংলা 'হ' সম্পর্কে বিশদ আলোচনা পরে করা হবে।

অর্ধ-স্বর (semi vowel) ঃ—শ্রুতিগ্রাহ্য দ্যোতনার দিক থেকে বাগধ্বনিকে স্বর ও ব্যঞ্জনের তুই বৃহত্তর পর্যায়ে ভাগকরা হয়ে থাকে। বাগধ্বনির এ বিভাগ মতে দেখা যায় যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় যে কোনো স্বরধ্বনির দ্যোতনা অনেক বেশী এবং অঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনি এক রকম ব্যঞ্জনাহীনই। বাগধ্বনির শ্রুতি-নির্ভর এ ভাগমতে স্বর

ও ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো যথারীতি আলাদা হয়ে যাবার পরেও কতকগুলো ধ্বনি পাওয়া যায় যা এ ব্যাখ্যা মতে না-স্বর ও না-ব্যঞ্জনভাগে পড়ে। ধ্বনিতাত্ত্বিকেরা এ-সব ধ্বনিকে অর্ধ-স্বর পর্যায়ে ফেলতে চেয়েছেন। তাঁরা অবশ্য এ-কথাও স্বীকার করেন যে, এ সংজ্ঞাটি খুব সুপ্রদ নয়। দ্যোতনাহীনতার জন্যে যদি অর্ধ-স্বরকে অর্ধ-স্বর বলা হয়, ঠিক একই কারণে এহেন ধ্বনিকে অর্ধ-ব্যঞ্জন ধ্বনি বা ব্যঞ্জনজাতীয় স্বরধ্বনিও (consonantal vowel) বলা যেতে পারে। কথা বলার সময় অনর্গল ধ্বনিস্রোতের দু'টি স্বরের মাঝখানে অর্ধ-স্বরের তথা অর্ধ-ব্যঞ্জনের সাধারণ অবস্থান দেখা যায়। যেমন 'নোয়া' 'পোয়া'-প্রভৃতি শব্দে 'ো' এবং 'া'র মাঝে উত্থিত 'w' (ব্) শ্রুতি। পাশাপাশি দু'টো স্বরধ্বনির তুলনায় দ্যোতনার দিক দিয়ে স্বতোত্থিত এ শ্রুত ধ্বনিটির দ্যোতনা অনেক কম। সেদিক থেকে ধ্বনির সূক্ষ্মবিভাগ মতে এ জাতীয় ধ্বনিকে অর্ধ-ব্যঞ্জনধ্বনিও বলা যায়। তা ছাড়া 'নয়', (noe), যায় (jae) বউ (bou) প্রভৃতি শব্দের falling diphthong বা পতনশীল দ্বিস্বরধ্বনি (diphthong)-র শেষ স্বরটি পুরোপুরি উচ্চারিত না হওয়ায় এর দ্যোতনাও প্রথম স্বরধ্বনির তুলনায় কমে আসে। এছাড়াও 'বাক্', 'হাত্', প্রভৃতি শব্দে বদ্ধ অক্ষর (closed syllable) উচ্চারণে 'ক্' 'ত্' প্রভৃতি অক্ষরান্ত ধ্বনি যেমন শ্বাসকে ক্ষণিকের জন্য আট্‌কে দেয় ঠিক তেমনি 'নয়', 'যায়' প্রভৃতি শব্দে দ্বিস্বরের (diphthong) শেষধ্বনিও শ্বাসকে একই ভাবে ক্ষণিকের জন্য রোধ করে ধরে। অর্ধ-স্বরধ্বনির সাহায্যে এ ধরণের ব্যঞ্জনজাতীয় ধ্বনির কাজ হয় দেখে এ-জাতীয় ধ্বনিকে এ-অবস্থায় consonantal-ও বলা যেতে পারে। বায়ুপথ সংকীর্ণ হয়ে ঘষা লাগা লাগা পর্যায়ে এসে পৌঁছে অথচ যথাযথ ঘষা লাগে না দেখে অর্ধ-স্বর বা অর্ধ-ব্যাঞ্জনধ্বনিও যেমন ঘর্ষণজাত ধ্বনিও নয় তেমনি বায়ুপথের সংকীর্ণতম অবস্থায় উচ্চারিত হয় দেখে দ্যোতনার দিক থেকে এ ধ্বনি স্বর বা ব্যাঞ্জনধ্বনির তুলনায় অপেক্ষাকৃত গুরুত্বহীন এবং লঘুভার।

ব্যঞ্জনধ্বনির পরিচিতির যে পাঁচটি প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে (ক) উচ্চারণের স্থান এবং (খ) উচ্চারণস্থানে বায়ুপথের রূপ তথা উচ্চারণ রীতিই প্রধান। বাকী তিনটি যথা (গ) কোমল তালুর অবস্থা এবং (ঘ) স্বর-যন্ত্রের অবস্থা এবং (ঙ) স্বল্পপ্রাণতা ও মহাপ্রাণতার কথাও প্রথম পরিচিতি-পর্যায় দু'টোর মধ্যেই এসে পড়ে; তবু (গ), (ঘ) এবং (ঙ) বিভাগ ধ'রেও প্রত্যেকবারই সমগ্র ব্যঞ্জনধ্বনিকে স্বতন্ত্রভাবে দুই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

(গ) নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় কোমল তালু ঝুলে নীচে নামে, অন্য-কথায় মুখের বিশ্রামকালীন কথা না বলা অবস্থায় থাকে এবং নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি ছাড়া অন্যান্য সকল ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের বেলাতেই কোমল তালু চেঁড়ে উঠে নাসাপথ বন্ধ করে নেয়। আনুনাসিক স্বরধ্বনির বেলাতে না-উঁচু না-নীচু এমন মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে, এবং মৌখিক স্বরধ্বনির বেলাতেও কোমল তালু উঁচু হয়ে যায়। এদিক থেকে নাসিক্য ব্যঞ্জনকে (এবং সানুনাসিক স্বরধ্বনিকেও) এদিকে ফেলে অন্যান্য সমস্ত ব্যঞ্জন (এবং মৌখিক স্বরধ্বনি oral vowels as opposed to nasalized vowels) ধ্বনিকে অন্যদিকে ফেলা যায়।

(ঘ) ধ্বনি উচ্চারণকালে স্বর-যন্ত্রের অবস্থা বিচার করেও সমগ্র ব্যঞ্জনধ্বনিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যে সব ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বর-যন্ত্র (larynx) এর ভেতরকার স্বরতন্ত্রী (vocal cords) কাঁপেনা, সেগুলো অঘোষধ্বনি unvoiced বা voiceless sounds আর যেগুলো উচ্চারণে স্বরতন্ত্রী রীতিমত কেঁপে ওঠে সেগুলো ঘোষধ্বনি বা voiced sounds। বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে অঘোষধ্বনি 'ক', 'চ', 'ট', 'ত', 'প', 'খ', 'ছ', 'ঠ', 'থ', 'ফ', 'শ', 'স' এবং ঘোষধ্বনি 'গ', 'জ', 'ড', 'দ', 'ব', 'ঘ', 'ঝ', 'ঢ', 'ধ', 'ভ', 'ঙ', 'ন', 'ম', 'র', 'ল' 'ড়', 'ঢ়', 'হ', 'র্হ', 'মহ', 'ল্হ', 'ন্হ'। আগেকালের ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে অঘোষ-ধ্বনিকে শ্বাস ধ্বনি breath sounds, hard sounds বা tenues এবং ঘোষধ্বনিকে নাদধ্বনি, কোমলধ্বনি তথা soft sound এবং mediae-ও বলা হয়।

(ঙ) ফুস্‌ফুস্‌ চালিত বাতাসের চাপের স্বপ্লতা এবং আধিক্যের দিক থেকেও পাক-ভারত উপমহাদেশের বিশেষতঃ আধুনিক আর্য ভাষাসমূহের ব্যঞ্জনধ্বনি-গুলোও মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। বাতাসের চাপের স্বল্পতাকে 'স্বল্পপ্রাণ' এবং আধিক্যকে 'মহাপ্রাণ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। আধুনিক পাক-ভারতীয় আর্য ভাষার ধ্বনিগুলোর উৎপত্তি হয় বৈদিক আর্য ভাষা থেকে।বৈদিক আর্যভাষার ব্যঞ্জন-ধ্বনির মহাপ্রাণতা আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতেই প্রথম দেখা যায়। অন্যকথায় আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ব্যঞ্জনধ্বনির মহাপ্রাণতা বৈদিক আর্য তথা সংস্কৃত ভাষার সমসূত্রে আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষাগুলোতে রক্ষিত হয়েছে। শ্বাস বা প্রাণবায়ুর স্বল্পতা ও আধিক্য দিয়ে ব্যঞ্জনধ্বনির বিভাগ সে-সূত্রে বাংলাতেও এসেছে। বাংলা

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলোর নানা পরিণতি দেখা যায়, কিন্তু চলতি কথ্য বাংলায় মহাপ্রাণ ধ্বনি যথাযথ রক্ষিত হয়ে স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনির 'স্বল্পপ্রাণ' এবং 'মহাপ্রাণ' ভাগকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। স্বল্পপ্রাণতা ও মহাপ্রাণতার বৈপরীত্য (opposition) এর দিক থেকেও স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর পার্থক্য সূচিত হয়েছে। কিন্তু শুধু মহাপ্রাণতা রয়েছে স্পর্শহীন কথ্য উষ্মধ্বনি 'হ্'-তে। স্পর্শধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুস্‌ফুস্‌-আগত বাতাস উচ্চারক তু'টির পেছনে এসে জমা হয় এবং উচ্চারক তু'টি আল্‌গা হওয়ার সময় ফট্‌কার মতো ধ্বনি করে বাতাস বের হয়ে যায়—স্বল্পপ্রাণ এবং মহাপ্রাণ তু'রকম স্পর্শধ্বনির বেলাতেই এ-রকমটি হয়; কিন্তু মহাপ্রাণ স্পর্শ-ধ্বনির উচ্চারণের সময় ফুস্‌ফুস্‌ চালিত বাতাসের বেগ হয় বেশী, ফলে উচ্চারক তু'টি উচ্চারণের স্থান থেকে আল্‌গা হওয়ার সময় ফট্‌কার মতো আওয়াজটিও হয় দ্বিগুণ জোরে। সহজ কথায় মহাপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারণের সময় 'এক ঝলক' কিংবা 'এক হল্‌কা' বাতাস দ্রুত বেরিয়ে যায়। মুখের সামনে একটি পাতলা কাগজ কিংবা পাঁচ দশটাকার নোট ধরে তুলনামূলকভাবে স্বল্প ও মহাপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারণ করলে দেখা যাবে স্বল্পপ্রাণ ধ্বনির সময় কাগজ কিংবা নোটটি যতটুকু নড়ছে, মহাপ্রাণ ধ্বনির সময় নড়ছে তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে।

বাংলার স্বল্পপ্রাণ ধ্বনি :—বর্গীয় ধ্বনিগুলোর প্রথম এবং তৃতীয় ধ্বনি, যেমন, 'ক', 'গ', 'চ', 'জ', 'ট', 'ড', 'ত', 'দ', 'প', 'ব' এবং 'র', 'ল', 'ড়', 'ন', 'ম', 'ঙ', এবং 'শ', 'স'।

আর মহাপ্রাণ ধ্বনি :—বর্গীয় ধ্বনিগুলোর দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্বনি, যেমন, 'খ', 'ঘ', 'ছ', 'ঝ', 'ঠ', 'ঢ', 'থ', 'ধ', 'ফ', 'ভ', এবং 'ঢ়', 'হ', 'ন্‌হ', 'র্‌হ', 'ম্‌হ', 'ল্‌হ'।

উপরোক্ত ধ্বনিগুলোর মধ্যে (চ্), (ছ্), (জ্), (ঝ্) জাতীয় ঘৃষ্টধ্বনিগুলো হয় আঞ্চলিক কিংবা অপ্রধান। বাংলা চ বর্গের দন্তমূলীয় প্রশস্ত ধ্বনি চলিত বাংলায় যত না ঘৃষ্ট তার চেয়ে বেশী স্পৃষ্ট। 'Palatograph'এর সাহায্যে গবেষণাগারে পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে চলিত বাংলায় এ ধ্বনিগুলো স্পৃষ্টধ্বনি বা plosive sounds; কিন্তু আঞ্চলিক পরিভাষায়, যেমন, ঢাকার কুট্টিদের উপভাষায় এ-ধ্বনিগুলো রীতিমতো ঘৃষ্টধ্বনি বা affricate soundsই এবং পূর্ববাংলার অঞ্চলবিশেষে এ ধ্বনিগুলো

আবার শিসজাত। এ ছাড়া চ বর্গের ধ্বনি স্পৃষ্ট না ঘৃষ্ট না শিসজাত তাও নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষের উচ্চারণের ওপর। স্পৃষ্ট ঘৃষ্ট কিংবা শিসধ্বনির সংজ্ঞা মতে যে উচ্চারণ পাওয়া যাবে ব্যক্তিবিশেষের মুখের ধ্বনিকে সে সংজ্ঞাভুক্ত করলে ধ্বনি-তাত্ত্বিকদের আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে না।

বাংলা হরফের (ন্‌হ), (ল্‌হ), (র্‌হ), (ম্‌হ), (ফ, f)(ভ, V) ধ্বনিগুলো দ্রুত কথা বলার সময়ে অনর্গল ধ্বনিস্রোতে স্বতোৎসারিত হয়, কিংবা শব্দের ভেতরে স্থানভেদে নির্দিষ্ট কতকগুলো স্থানে ব্যবহৃত হয় ; শব্দের আদিতে, মধ্যে, অন্তে—সর্বত্র ব্যবহৃত হয় না।

দুই

এ পর্যন্ত যে আলোচনা করলাম তা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, সুতরাং এ সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন বোধ করছি।

প্রত্যেকটি ধ্বনিই প্রত্যেকটি ধ্বনি থেকে স্বতন্ত্র। এ স্বাতন্ত্র্যই ধ্বনির বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করে এবং সে বিশিষ্টতাই প্রত্যেকটি ধ্বনিকে স্বতন্ত্র অর্থজ্ঞাপক পদার্থের মতো চিহ্নিত ক'রে তোলে। লণ্ডন, প্যারিস, ওয়াশিংটন প্রভৃতি বড়ো বড়ো শহরে যানবাহন নিয়ন্ত্রিত করার জন্যে স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা আছে। উক্ত ব্যবস্থামতে প্রতি দু'মিনিট অন্তর আপনা থেকে রাস্তার মোড়ে মোড়ে ল্যাম্পপোষ্টগুলোতে বাতি জ্বলে ওঠে। লাল, সবুজ, হলুদ রঙের বাতি। কে জ্বালাচ্ছে, কোথা থেকে জ্বলছে তা দেখা যায় না কিন্তু জ্বলে সত্যি। জীবনে যারা প্রথম যানবাহন নিয়ন্ত্রণের এ ব্যবস্থার সংগে পরিচিত হয়, সমস্ত ব্যবস্থাটাই তাদের কাছে ঐন্দ্রজালিক কিংবা ভৌতিক বলে প্রতিভাত হয়। সে যা হোক, বাতির রং লাল হ'লে দেখা যাবে সমস্ত যানবাহনই দাঁড়িয়ে গেছে, হলুদ হ'লে গন্তব্য পথে রওয়ানা হবার জন্যে তৈরী হচ্ছে আর সবুজ হলে স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এসব যানবাহনের জন্য বাতির লাল, হলুদ ও সবুজ রং বহন করছে এক একটা ইংগিত, এক একটা ইশারা। বাতির এ রূপ পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে ফুটে উঠ্ছে এক একটা অর্থ। বাতির রং মানুষের মুখের ভাষা নয় কিন্তু মুখের ভাষার মতই কাজ করছে; বহন করছে এক একটা ভংগী জ্ঞাপক দ্যোতনা।

মানুষের সমাজ জীবনের চলার পথে এক মানুষ অপর মানুষের কাছে নিজেকে সুস্পষ্ট ক'রে তোলার জন্যে এ ধরণের লাল কি সবুজ বাতির মতোই নানা প্রতীক ব্যবহার করে। এ প্রতীকগুলো বাইরের জিনিস নয়, সমাজ-স্বীকৃত অর্থবোধক মৌখিক ধ্বনিই। লাল এবং হলুদ রংএ যে তফাৎ অর্থনির্দেশক প্রত্যেকটি মৌখিক প্রতীক (vocal symbol)এর পরস্পরের মধ্যে সেই পার্থক্য। কারুর সংগে কোন একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বল্‌লাম 'আচ্ছা, কাল কাটবো।' আমার শ্রোতার কাছে নিজেকে এ অর্থে পরিস্ফুট ক'রে তোলাই হয়ত আমার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তাড়াতাড়ি বলতে গিয়ে বাক্যটির আর সব ধ্বনি যথাযথ রেখে জিভের কোন পাক-চক্রে 'কাল' এর 'ক' এর স্থানে হঠাৎ হয়ত 'খ' ব'লে ফেল্‌লাম। শ্রোতার কানে গিয়ে আঘাত লাগলো 'আচ্ছা, 'খাল' কাট্‌বো।' সে হতচকিত হলো, হয়তো বা বক্তাকে ভুল বুঝালো, নয়তো বা বোকা ঠাওরালো। 'ক' এবং 'খ' এর মধ্যে এমন কি পার্থক্য আছে, যার ফলে স্বতন্ত্রভাব আমাদের মনে স্পন্দন জাগায়, স্বতন্ত্র অর্থ ঐ ধ্বনির সংগে জড়িয়ে থেকে ধ্বনিটিরই স্বাতন্ত্র্য জাহির করে? শুধু 'ক' ও 'খ' নয়, স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির প্রত্যেকটিই প্রত্যেকটি থেকে এ ধরণের স্বাতন্ত্র্যের দাবীদার। এখানে সগোত্র বা ভিন্ন গোত্রের ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর একটা থেকে আর একটা কি বৈশিষ্ট্যে আলাদা হ'য়ে যাচ্ছে সে আলোচনাই কর্‌ছি।

পূর্ব পরিচ্ছেদে বাংলার ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে উচ্চারণের স্থান অনুসারে নয় শ্রেণীতে এবং উচ্চারণের রীতি অনুসারে সাত শ্রেণীতে ভাগ ক'রে দেখানো হয়েছে। ধ্বনি-সৃষ্টির ব্যাপারে উচ্চারণের স্থান এবং রীতিই সব চেয়ে বড়ো কথা। সেদিক থেকে প্রত্যেক স্তরের ধ্বনিরই পৃথক আলোচনার প্রয়োজন। প্রথমেই ধরা যাক উচ্চারণ রীতির দিক থেকে স্পর্শ বা স্পৃষ্ট ধ্বনির কথা। চলতি সাধু বা কথ্য বাংলায় (আঞ্চলিক বাংলায় নয়) 'ক', 'চ', 'ট', 'ত' এবং 'প' বর্গের স্পর্শধ্বনি বিশটি, মতান্তরে ষোলটি (এ মতান্তর 'চ' বর্গের ধ্বনিগুলোকে নিয়ে তা আগেই বলেছি)। উচ্চারণের স্থান অনুসারে এ স্পর্শধ্বনিগুলোকে চারটি চারটি ক'রে আবার পাঁচভাগে ভাগ করা হয়েছে। যে সাধারণ লক্ষণ, গুণ বা রীতি বাংলার এ বিশটি ব্যঞ্জন-ধ্বনিকে অন্যান্য ধ্বনি থেকে স্বতন্ত্র ক'রে দিয়েছে তা এদের স্পর্শতা 'গুণ'।' এ গুণটিই হচ্ছে এ ধ্বনিগুলোর 'greatest common factor', পূর্ব পরিচ্ছেদে দেখা গেছে

এ গুণ যথাক্রমে তিনটি পর্যায়ের সমষ্টি যথা—(১) ধ্বনি সংগঠনের জন্য উক্ত ধ্বনির প্রয়োজনানুসারে উচ্চারণ স্থান দু'টির সংস্পর্শ (২) সংস্পৃষ্ট অবস্থায় ক্ষণকালের জন্য উচ্চারক দুটির অবস্থান এবং (৩) উচ্চারক দু'টো পৃথক হ'য়ে বাতাস বেরিয়ে যাওয়া। এ সাধারণ গুণ আলোচ্য বিশটি ধ্বনিতে থাকা সত্ত্বেও উচ্চারণের স্থান অনুসারে পাঁচটি ছোট ছোট শাখায় বিভক্ত হ'য়ে এরা বৈশিষ্ট্য নিরূপক হ'য়ে উঠছে। আবার উচ্চারণের স্থান অনুসারে এ পাঁচ শাখার প্রত্যেকটিতে যে চারটি করে ধ্বনি আছে তারাও বিশেষগুণে প্রত্যেকটি থেকে প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র হয়ে গেছে। কি ক'রে তা সম্ভব হয় সে কথাই বলছি।

'ক' বর্গীয় স্পর্শধ্বনি

প্রথমেই 'ক' বর্গের ধ্বনিগুলোর কথা ধরা যাক। বহু বাংলা ব্যাকরণে 'ক' বর্গীয় ধ্বনিগুলোকে কণ্ঠ্যধ্বনি নামে অনেক বৈয়াকরণই অভিহিত করেছেন। অধিকাংশ বৈয়াকরণই ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত নন; অথচ গতানুগতিকতার জের টেনে তাঁরা এ ধরণের নামকরণ করে থাকেন। এ বিষয় সম্পর্কে অনভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও যাঁরা বাংলা ব্যাকরণ লেখেন এ দোষ যে সবটাই তাঁদের তা নয়। আসলে খৃষ্টপূর্ব সপ্তম থেকে তৃতীয় শতকের মধ্যে যাস্ক, পাণিনি, পতঞ্জলি প্রমুখ বৈয়াকরণরা সংস্কৃত ধ্বনিগুলোর যে শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন, আজও পর্যন্ত এ উপমহাদেশের সংস্কৃত থেকে কালের নিয়মে উদ্ভূত ভাষাসমূহের ধ্বনিগুলোর শ্রেণীবিন্যাস সেভাবেই রয়ে গেছে। বিশ্ব-বিশ্রুত উক্ত ব্যাকরণবিদরা প্রথমত নিজেদের উচ্চারিত মৌখিক ভাষারই বিশ্লেষণ করেছিলেন; দ্বিতীয়ত তাঁরা উত্তর পশ্চিম ভারতের (বর্তমানের পশ্চিম পাকিস্তানের) যে সব অঞ্চলে বাস করতেন, সে কালে সেসব অঞ্চলের উচ্চারণের ওপর নির্ভর করেই তাঁরা মানুষের মুখের ভাষার চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছিলেন। অথচ ভাষাবিজ্ঞানের সংগে যাঁদের সামান্য পরিচয়ও আছে তাঁরা জানেন যুগে যুগে ভাষা পরিবর্তিত হয় এবং ভাষার এ পরিবর্তন আসে এক মানুষ থেকে অন্য মানুষের উচ্চারণের পার্থক্য এবং ভিন্নতার ভেতর দিয়ে। একটা ভৌগোলিক ভূখণ্ডের জলবায়ু আহার-বিহার এবং জীবন-যাত্রার ধরণধারণও অনেকাংশে ভাষা তথা ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে পাণিনি প্রমুখ বৈয়াকরণদের সময়ে 'ক' বর্গীয় স্পৃষ্টধ্বনির উচ্চারণ ق আরবী এর মতো হয়ত বা কণ্ঠ্যই ছিল। কিন্তু তুহাজার বছরেরও অধিককালের ব্যবধানে এবং তাঁদের দেশ থেকে হাজার মাইলের বেশী দূরে অবস্থিত জলো বাংলা দেশের মাটিতে এ ধ্বনিগুলো কণ্ঠ নিঃসৃত (uvular) না হয়ে জিহ্বামূলীয় বা পশ্চাত্তালুজাত (velar) হয়ে গেছে। আরবী ق জাতীয় ধ্বনির তুলনায় বাংলার 'ক' বর্গীয় স্পৃষ্টধ্বনি গলনালী বা কণ্ঠোচ্চারিত না হ'য়ে আরও কিছুটা এগিয়ে উচ্চারিত হয়। একারণে আমাদের 'ক' বর্গীয় ধ্বনিগুলোকে আমি পশ্চাত্তালুজাত বলাই বাঞ্ছনীয় মনে করি।

এ বর্গে আছে 'ক', 'খ', 'গ', 'ঘ' এ চারটি ধ্বনি। এদের সাধারণ লক্ষণ 'স্পর্শতা গুণ' এবং উচ্চারণ স্থান একই। অর্থাৎ এ ধ্বনিগুলো জিহ্বামূলীয় পশ্চাত্তালুজাত ধ্বনি। এ ধ্বনিগুলো উচ্চারণে জিভের পশ্চাদ্ভাগ কোমল তালুর দিকে উঁচু করা হয়। কোমলতালুতে চাঁড় লাগে, তার বিশ্রামকালীন স্বাভাবিক অবস্থা থেকে কিছুটা উঁচু হয় আর এ দিকে জিভের পশ্চাদ্ভাগও উঁচু হ'য়ে গিয়ে তার সংগে সংস্পর্শ ঘটায়। ফুস্‌ফুস্‌-তাড়িত বাতাস ইত্যবসরে পশ্চাদ-জিভ এবং পশ্চাত্তালুর সংস্পৃষ্ট অবস্থার পিছনে এসে আঁটকা পড়ে। ক্ষণমুহূর্ত পরেই এদের সংস্পৃষ্ট অবস্থা ছুটে যায় এবং এদের পেছনের অবরুদ্ধ বাতাসও মুখপথে ফট্‌ ক'রে বেরিয়ে যায়। উচ্চারণের এ প্রক্রিয়াটুকু এ চারটি ধ্বনিতেই সমান। সে জন্যেই এ পর্যন্ত ধ্বনি হিসেবে এ চারটি ধ্বনিই একই স্থানজাত অর্থাৎ জিহ্বামূলীয় বা পশ্চাত্তালুজাত স্পৃষ্ট ধ্বনি। কিন্তু স্থান এবং স্পর্শতা গুণ এক হওয়া সত্ত্বেও উচ্চারণ রীতি অনুসারে দেখা যাচ্ছে প্রথম ধ্বনিটি অর্থাৎ 'ক' উচ্চারণের সময় (১) স্বরতন্ত্রী কেঁপে ওঠেনি, এবং (২) সংস্পৃষ্ট উচ্চারক তু'টি মুক্ত হবার সময় তাদের পেছনের রুদ্ধ বাতাস সজোরে নিষ্ক্রান্ত হয়নি। ধ্বনিটি গঠিত এবং উচ্চারিত হবার সময় স্বরতন্ত্রী কাঁপিয়ে তুলতে পারেনি বলে তা 'অঘোষ ধ্বনি'—ঘোষ ধ্বনি নয়; আর রুদ্ধ বাতাস বেরোনোর সময় সজোরে না বেরিয়ে সাধারণভাবে বেরিয়েছে ব'লে ধ্বনিটি 'স্বল্পপ্রাণ',—মহাপ্রাণ নয়। সহজ কথায় 'ক' নামক হরফটিতে যে ধ্বনি জড়িয়ে আছে তা হচ্ছে পশ্চাত্তালুজাত বা জিহ্বামূলীয় অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি। অন্যকথায় পশ্চাত্তালুজাত বা জিহ্বামূলীয় অঘোষ অল্প-প্রাণ স্পর্শধ্বনিটির স্মারকচিহ্ন ঐ 'ক' নামক হরফটি। এ হরফটি দেখলে আমরা যে ধ্বনি করি তার ধ্বনিঘটিত নামই হলো জিহ্বামূলীয় অঘোষ ও অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি।

'ক' হরফের ধ্বনিগত সংজ্ঞাটির আরও একটু ব্যাখ্যা চাই। জিহ্বামূলতা এবং স্পর্শতা তো এর সংগেকার আরও তিনটি ধ্বনির রয়েছে। সেখানে এ ধ্বনিটিও ওদের সামিলই। কিন্তু যেখানে এ নিজের নাম মাহাত্ম্যে আলাদা, তা হলো, এর অঘোষতা অল্পপ্রাণতা-এ দুটো ধ্বনিগুণের জন্যেই 'ক' পৃথক হলো 'খ' থেকে, হলো 'গ' থেকে, হলো 'ঘ' থেকে।

'ক' যে ভাবে এবং যেখান থেকে উচ্চারিত হয়েছে 'খ' ও ঠিক সেখান থেকেই এবং অনেকটা সে ভাবেই উচ্চারিত হয়। 'অনেকটা'—এ জন্যে বলছি যে নিশ্চয় তা হ'লে এদের পরস্পরের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। সে পার্থক্য হলো 'ক' এর স্বল্পপ্রাণতা এবং 'খ' এর মহাপ্রাণতা। 'ক' এবং 'খ' এর মধ্যে অন্যান্য সমস্ত বৈশিষ্ট্য এবং গুণই রয়েছে এক। কিন্তু এদের উচ্চারকদ্বয়ের পেছনের দিকে ফুস্‌ফুস্‌ থেকে সঞ্চিত বাতাস বেরোনোর সময় তা এদের দু'টোর মধ্যেকার ধ্বনিগুণের তারতম্য নির্ণীত ক'রে দিয়ে গেছে। 'ক' উচ্চারণের সময় বাতাস উচ্চারকদ্বয়কে আলগা ক'রে সজোরে বেরোয়নি, কিন্তু 'খ' উচ্চারণের সময় রীতিমতো সজোরে বেরিয়েছে। বাতাস বেরোনোর এ বৈপরীত্য বা opposition গুণই এ ধ্বনি দুটোর একটিকে আর একটি থেকে করে তুলেছে পৃথক, দিয়েছে একটি থেকে আর একটিকে স্বাতন্ত্র্য। প্রাণবায়ুর সজোর নির্গমনের জন্য 'খ' এর নাম হয়েছে 'মহাপ্রাণ ধ্বনি'। 'ক' এর ধ্বনিগত নাম যখন জিহ্বামূলীয় বা পশ্চাত্তালুজাত অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি, 'খ' তখন চিহ্নিত হচ্ছে জিহ্বামূলীয় বা পশ্চাত্তালুজাত অঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে। এ থেকে বোঝা যাবে 'ক' এবং 'খ' উভয় ধ্বনির উচ্চারণেই স্বরতন্ত্রীর কাজ নেতিবাচক (negative), ইতিবাচক (positive) নয় অর্থাৎ এ দু'টি ধ্বনির কোনটির উচ্চারণেই স্বরতন্ত্রী সক্রিয়ভাবে কেঁপে ওঠে না, থাকে নিষ্ক্রিয়।

'ক' এর স্বল্পপ্রাণতা এবং 'খ'এর মহাপ্রাণতা এ ধ্বনিগুণ বা ধ্বনিরীতি দিয়ে পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়েছে। এদের উচ্চারকদ্বয়ের পশ্চাৎরুদ্ধ বাতাস-নির্গমনের প্রক্রিয়া এনেছে এদের মধ্যে তারতম্য এবং বৈশিষ্ট্য। কি গুণে 'ক' এবং 'গ' কি 'খ' এবং 'গ' পৃথক হচ্ছে এবারে তা দেখা যাক। উচ্চারণের স্থান এবং স্পর্শতাগুণ এদের সবের মধ্যে ঠিকই আছে কিন্তু 'ক' এবং 'গ' এর মধ্যে পার্থক্য এসেছে স্বরযন্ত্রে নিষ্ক্রিয়তা ও সক্রিয়তার বৈচিত্র্য থেকে। 'ক' উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীতে কাঁপন লাগেনি, 'গ' উচ্চারণে লেগেছে।

'গ' উচ্চারণে স্বরতন্ত্রী কাঁপে কি না তা ভালো বোঝা যাবে ছু'কান ছু'হাতের তালু দিয়ে বেশ চেপে বন্ধ ক'রে পরপর 'ক' এবং 'গ' উচ্চারণ করলে কিংবা শিশু কালে আমাদের মাথার খুলির মধ্যদেশে যে জায়গাটি তুলতুল করে সে জায়গাটি ডান কি বাম হাতের তালু দিয়ে চেপে ধ'রে পর পর এ ছু'টো ধ্বনি উচ্চারণ করলে কিংবা আমাদের পুরুষদের স্বরযন্ত্রের যে অংশটি গলার ওপরে বাইরে থেকে উঁচু হয়ে থাকতে দেখা যায় (হ্যাংলা কি মদ্দ মেয়ে না হ'লে সাধারণত মেয়েদের উঁচু হয় না) সেখানে আঙুল ছুঁয়ে পর পর ছু'টো ধ্বনি উচ্চারণ করলে। 'গ' উচ্চারণ কালে স্বরযন্ত্রস্থিত স্বরতন্ত্রী ছু'টোতে একটা যে কাঁপুনির সৃষ্টি হয় এসব জায়গায় হাত দিয়ে তা ভালো বোঝা যায় ; অথচ একইভাবে হাত ছুঁয়ে 'ক' উচ্চারণের সময় সে বোধ তেমন জাগে না। অন্যান্য গুণের আপাত সাম্য থাকা সত্বেও স্বরযন্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা এবং সক্রিয়তা দিয়ে 'ক' এবং 'গ' পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেছে। সে জন্যে 'ক' এর ধ্বনিগত নাম যখন জিহ্বামূলীয় বা পশ্চাত্তালুজাত অল্পপ্রাণ অঘোষ স্পর্শ-ধ্বনি, 'গ' তখন পরিচিত হয় জিহ্বামূলীয় বা পশ্চাত্তালুজাত অল্পপ্রাণ ঘোষ স্পর্শ-ধ্বনি নাম নিয়ে।

'ক' এবং 'খ' এর মধ্যে কিংবা 'ক' এবং 'গ' এর মধ্যে যে ধ্বনিগত পার্থক্য তা এদের পরস্পার থেকে পরস্পরের একটি বিশিষ্টতা দিয়ে। 'ক' এবং 'খ' এর মধ্যেকার পার্থক্য পরস্পরের স্বল্পপ্রাণতা এবং মহাপ্রাণতা দিয়ে, আর 'ক' এবং 'গ' এর মধ্যে পার্থক্য অঘোষতা এবং ঘোষতা দিয়ে, কিন্তু 'খ' এবং 'গ' এর ভেতরের পার্থক্য সূচিত হচ্ছে তাদের পরস্পরের দ্বিবিধ গুণগত দিক থেকে। 'খ' এর সংগে জড়িয়ে আছে মহাপ্রাণতা আর অঘোষতা গুণ, কিন্তু 'গ' এর ভেতরে আছে ঘোষতা আর স্বল্প-প্রাণতা। 'ক', 'খ', কিংবা 'ক' 'গ' এর চেয়ে 'খ' এবং 'গ'এর ভেতরের বৈপরীত্যের (opposition) পরিমাণ বেশী আর উক্ত বৈপরীত্যের সাহায্যেই তারা পরস্পরে স্বতন্ত্র অর্থজ্ঞাপক ধ্বনি হিসেবে আমাদের ভাষায় ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

এবারে 'ক' এবং 'খ' এর ধ্বনিগুণগত পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা যাক। উচ্চারণের স্থান এবং স্পর্শতা গুণ এ ছু'টো ধ্বনিতেও আছে এদের গোত্রের অন্যান্য ধ্বনিগুলোর মত একই রূপে। অথচ পরস্পরের পার্থক্য সূচিত হচ্ছে একটিতে স্বল্প-প্রাণতা এবং অঘোষতা দিয়ে আর অন্যটিতে মহাপ্রাণতা ও ঘোষতা দিয়ে। অর্থাৎ

'ক' স্বল্পপ্রাণ অঘোষ ধ্বনি কিন্তু 'খ' ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি। 'ঘ' এর ধ্বনিগত নাম জিহ্বামূলীয় বা পশ্চাত্তালুজাত মহাপ্রাণ ঘোষধ্বনি। একটি ধ্বনিকে এ নামে অভিহিত করলে যে হরফটি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার রূপরেখা হলো 'ঘ', অন্যভাবে বল্‌লে বলতে হয় 'ঘ' হরফের মধ্যে যে ধ্বনি সংশ্লিষ্ট হয়ে রয়েছে উচ্চারণ করলে তার ধ্বনিগত রূপবৈশিষ্ট্য আভাসিত হবে পশ্চাত্তালুজাত মহাপ্রাণ স্পৃষ্ট ঘোষধ্বনির ভেতর দিয়ে।

'ক' এবং তার সমস্থানোদ্‌গত বাকী তিনটি ধ্বনি 'খ', 'গ' এবং 'ঘ'এর মধ্যে গুণগত এধরনের পার্থক্য থাকলেও পরস্পরের মধ্যে স্পর্শতাগুণের ঐক্য থাকার জন্যে পাণিনি প্রমুখ প্রাচীন ভারতীয় ধ্বনিবৈজ্ঞানিকগণ এগুলোকে 'ক' বর্গীয় ধ্বনি নামে অভিহিত করেছেন। 'বর্গীয় ধ্বনি'র অর্থ এদের পরস্পরের মধ্যেকার গুণগত সাম্য এবং ঐক্য এ ধ্বনিগুলোকে যেমন এক বর্গীয় বাঁধনে বেঁধেছে তেমনি এদের ভেতরের বৈপরীত্যগুণ এদের পরস্পরকে পরস্পর থেকে পৃথক করে দিয়েছে। এ দিকে থেকে বিচার ক'রেই 'প্রাগ স্কুলের' সুইসজার্মান ধ্বনিবিদ প্রিন্স ট্রুবেট্‌জ্‌কয় এদের ভেতরের bundle of co-relation এবং opposition counter এর কথার উল্লেখ করেছেন। Co-relation বা ঐক্য এদের চারটি ধ্বনির মধ্যেই যেমন রয়েছে তেমনি opposition বা বৈপরীত্যও রয়েছে এদের পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট। কিন্তু বৈপরীত্যের মাত্রা কমে এসে নিম্নতম একক অবলম্বনে পৃথক হয়েছে 'ক' থেকে 'খ'; 'খ' থেকে 'ঘ'; এবং 'ক' থেকে 'গ' আর 'গ' থেকে 'ঘ'। এ চারটি ধ্বনিকে এভাবে সাজালে আমাদের বক্তব্য আরও সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠবে :—

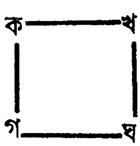

এর অর্থ 'ক' স্বল্পপ্রাণ, 'খ' মহাপ্রাণ, অঘোষতা দু'টিতেই সমান; 'গ' স্বল্পপ্রাণ 'ঘ' মহাপ্রাণ ধ্বনি, ঘোষতা দু'টিতেই বর্তমান। আবার 'ক' অঘোষ 'গ' ঘোষ; স্বল্প-প্রাণতার দিক থেকে দু'টিই এক জাতের; 'খ' অঘোষ আর 'ঘ' ঘোষধ্বনি; দু'টিতেই আছে মহাপ্রাণতা জড়িত। এদের এ পার্থক্য ধ্বনি গুণের ইতিবাচক হিসেবনিকেশ থেকে অর্থাৎ এদের কি কি গুণ আছে তা দিয়ে। এ ইতিবাচক ধ্বনিগুণই এদের

ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য নিরূপণে নেতিবাচক গুণেরও আভাস স্বতঃপ্রতিপন্ন করে দিচ্ছে। এর অর্থ উল্টোভাবে চিন্তা করলে 'ক' কিংবা 'খ'তে এমন কি ধ্বনিগুণ নেই যা 'গ' কিংবা 'ঘ'তে জড়িয়ে থেকে 'ক' এবং 'খ'কে 'গ' ও 'ঘ' থেকে আলাদা করে দিয়েছে এ কথা ভাবতে পারি। সে দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে 'ক'তে ঘোষতা নেই, মহাপ্রাণতা নেই, আর 'খ'তে ঘোষতা নেই, নেই স্বল্পপ্রাণতা ; আবার 'ক'তে ঘোষতা নেই, মহাপ্রাণতাও নেই, আর 'গ'তে নেই অঘোষতা এবং মহাপ্রাণতা। ঠিক তেমনি 'গ'তে মহাপ্রাণতা নেই, অঘোষতাও নেই ; আর 'ঘ'তে নেই অঘোষতা এবং স্বল্পপ্রাণতা ; আর 'খ'তে নেই ঘোষতা এবং স্বল্পপ্রাণতা আর 'ঘ'তে নেই অঘোষতা এবং স্বল্পপ্রাণতা। এভাবে প্রত্যেক ধ্বনির মধ্যে যে গুণ আছে তা নয় বরং যে গুণ নেই তা দিয়ে অন্যধ্বনি থেকে এর স্বাতন্ত্র্যও সূচিত ক'রে তোলা যায়। ধ্বনির এহেন বিশ্লেষণের মধ্যেও এক রকম বৈজ্ঞানিক সত্যানু-সন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রত্যেকটি ধ্বনিনির্দেশক এক একটী স্বতন্ত্র হরফ আছে। হরফগুলো যে ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনির প্রতীক এ সম্পর্কে আমরা চিন্তা করি বা না করি, সামান্য লেখাপড়া জানলেও এক একটা হরফ দেখে সেটা পড়তে গেলেই তার মধ্যে লিপ্ত ধ্বনিটি স্বতোচ্চারিত হ'য়ে যায়। যারা বিন্দুমাত্র লেখাপড়া জানেনা এবং কোন হরফের 'হ' ও চেনেনা তাদেরও দেখি কথার মাধ্যমে সমাজ জীবনে তাদের জীবনাভিনয় করতে। তাদেরও কথার মধ্যে যে বিচিত্র ধ্বনি ওঠে তার প্রত্যেকটিরই স্বতন্ত্র তরঙ্গ, স্বতন্ত্র আভাস, স্বতন্ত্র অর্থ বিদ্যমান রয়েছে। উচ্চারণ স্থান এক হওয়া সত্ত্বেও ধ্বনিগুণের সামান্যতম কি নিম্নতম বৈশিষ্ট্যে এক ধ্বনি অন্য ধ্বনি থেকে কি ভাবে পৃথক হ'য়ে গিয়ে পৃথক অর্থবোধক সম্পূর্ণ ভিন্ন শব্দ গঠন করে, বাংলা কিংবা সংস্কৃত গোষ্ঠীর অন্যান্য ভাষাগুলোর বর্গীয় ধ্বনিগুলোই তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আশপাশের সব ধ্বনি ঠিক রেখে উচ্চারণের স্থানের অভিন্নতার দিক থেকে বর্গীয় ধ্বনিগুলোর ধ্বনিগত সামান্যতম গুণের পরিবর্তন করলেই স্বতন্ত্র ধ্বনি উত্থিত হ'তে দেখি। ধ্বনিগত উক্ত স্বাতন্ত্র্যই নির্দেশ করে স্বতন্ত্র অর্থবোধক স্বতন্ত্র শব্দের। মানুষ মূর্খ হোক, বিজ্ঞ হোক, প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ভিন্নার্থবোধক সে শব্দই বাছাই ক'রে নিজের অজ্ঞাতসারে আপন কাজে লাগায়। 'ক' বর্গের চারটি ধ্বনিওয়ালা এ চারটি শব্দ নিই, যেমন :—

কো | ল ঃ—ক্ + ওল
খো | ল ঃ—খ্ + ওল
গো | ল ঃ—গ্ + ওল
ঘো | ল ঃ—ঘ্ + ওল

এ চারটি শব্দের শেষোক্ত ধ্বনি 'ল' এবং তার পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি 'ও' সমানভাবে চারটি শব্দেই যথারীতি বর্তমান রয়েছে। উচ্চারণ কালে বর্গীয় ধ্বনি চারটির গুণগত পার্থক্যের জন্য চারটি মৌখিক প্রতীক (vocal symbols) চারভাবে শ্রোতার কানের ভেতর দিয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছে চারটি স্বতন্ত্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে—ফলে তার মনের মধ্যে তরঙ্গ তুলেছে ভিন্নার্থবোধক চারটি শব্দ।

চ বর্গীয় স্পৃষ্টধ্বনি

উচ্চারণ স্থান এক হওয়া সত্ত্বেও ধ্বনির গুণগত দিক থেকে 'ক' বর্গের প্রত্যেকটি ধ্বনি যেমন প্রত্যেকটি থেকে পৃথক 'চ', 'ট', 'ত', এবং 'প' বর্গেরও এক থেকে অন্যধ্বনির মধ্যে তেমনি একই ভাবের পার্থক্য বিদ্যমান।

উচ্চারণ স্থানের দিক থেকে 'চ', 'ছ', 'জ', 'ঝ' এ চারটি ধ্বনিকে প্রশস্ত দন্ত-মূলীয় (dorso-alvelor) ধ্বনি বলা হয়েছে। প্রাচীন বৈয়াকরণরা 'চ', বর্গীয় ধ্বনি গুলোকে তালব্য ধ্বনি বলেছেন। নকল তালুর সাহায্যে গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে এ ধ্বনিগুলো শক্ত ও নরম তালু যা আমাদের কাছে সত্যকার তালু নামে পরিচিত তার সংগে জিভের প্রয়োজনীয় অংশের সংস্পর্শে উচ্চারিত হয় না। উপর পাটি দাঁতের মাড়ি (teeth ridge)কে সূক্ষ্মভাবে ভাগ করলে আমরা অগ্র-দন্তমূলীয় (pre-alveolar) এবং পশ্চাৎ দন্তমূলীয় (post alveolar) এ দু'ভাগ পাই। চ, ছ, জ, ঝ এ চারটি ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিভের ডগা এবং তৎ-সংলগ্ন ডগার পেছনের দিকে তথা জিভের পাতাকে তালুর অগ্র এবং পশ্চাৎ দন্ত-মূলের সংগে রীতিমতো প্রশস্তভাবে মেলে ধরা হয় ; জিভের ডগা নীচের পাটি দাঁতের গায়ে লেগে থাকে—ফলে জিভের পাতার চাপের সবটুকুই পড়ে পশ্চাৎদন্তমূলের ওপরে। তা ছাড়া জিভ উপরের মাড়ির দুপাশ ঘিষে এমন চওড়া ভাবে উঁচু হয় যে জিভের দুপাশ দুমাড়ির দুপাশকেও রীতিমতো ছুঁয়ে যায়। এ কারণেই চ বর্গীয়

ধ্বনিগুলোকে প্রাচীন বৈয়াকরণদের মত মতো তালব্য ধ্বনি নামে অভিহিত না করে dorso-alveolar বা প্রশস্ত দন্তমূলীয় ধ্বনি নামকরণ করতে চাই।

উচ্চারণ স্থানের দিক থেকে এ ধ্বনিগুলো সম্পর্কে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছুনোর পর এবারে এদের উচ্চারণ পদ্ধতির কথা ভেবে দেখতে হবে। প্রাচীন বৈয়াকরণদের অনেকেই 'চ' বর্গের ধ্বনিগুলোকে স্পৃষ্ট (plosives) না ব'লে affricates তথা ঘর্ষণজাত বা ঘৃষ্টধ্বনি বলতে চান। 'চ', 'ছ', 'জ' 'ঝ' এ ধ্বনিগুলো ঘৃষ্ট না স্পৃষ্ট এ নিয়ে ধ্বনিতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতভেদের অবকাশ আছে। এ মতভেদের স্বাভাবিকত্ব আমি স্বীকার করে নিয়েই এদের সম্পর্কে আলোচনায় রত হ'তে চাই। শুধু এ ধ্বনি ক'টার কথাই বা বলি কেন, ধ্বনি বিজ্ঞানের বর্তমান এ উন্নতির দিনে কোনধ্বনি বা ধ্বনি-বর্গ সম্পর্কে নির্ধারিত মত প্রচার করা যে কত বিপজ্জনক তা যাঁরা এ বিজ্ঞানের অগ্রগতির সংগে বিশেষ পরিচিত তাঁরাই স্বীকার করবেন। এ কালের ধ্বনি বৈজ্ঞানিক ধ্বনি বিশ্লেষণের জন্য হয় নিজের উচ্চারণকেই মূল অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেন কিংবা বিশ্লেষণ–গ্রাহ্য ভাষাভাষীদের নির্ভরযোগ্য একজন প্রতিনিধির উচ্চারণ অবলম্বনে সে ভাষার অঞ্চল বিশেষের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করার প্রয়াস পান। সুতরাং একজনের কিংবা অঞ্চল বিশেষের উচ্চারণ প্রকাণ্ড একটি দেশের ভাষাভাষীর এবং সর্বাঞ্চলেরই যে বৈশিষ্ট্য নিরূপক হবে এমন কথা অভিজ্ঞ ধ্বনিবিদ স্বীকার করেন না এবং দাবীও করেন না। উভয় বাংলার মতো এত বড় বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে ছ'কোটিরও অধিক সংখ্যক লোকের মাতৃভাষা যেখানে বাংলা সেখানে একজনের কিংবা এক অঞ্চলের লোকের উচ্চারণ দেশের সর্বাঞ্চলের এবং সকল মানুষের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের নিরূপক না হওয়াই স্বাভাবিক।

এভাবে বিচার করলে দেখা যাবে অঞ্চল বিশেষে 'চ' বর্গীয় ধ্বনিগুলো স্পৃষ্টধ্বনি, কোন অঞ্চলে এগুলো ঘৃষ্ট আবার কোন অঞ্চলে শিস বা উষ্মধ্বনিই। আলোচ্য প্রবন্ধে আমি চলতি উপভাষার বাংলা ধ্বনিরই (standard colloquial) বিশ্লেষণ করছি। এ বিশ্লেষণে আমি আমার নিজের উচ্চারণ এবং কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ ও শান্তিপুর অঞ্চলের মৌখিক ভাষা আমার কাছে যে ভাবে ধরা দিয়েছে আমি তা-ই মূল অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছি। এ সব অঞ্চলের 'চ' বর্গীয় ধ্বনি আমার কানে প্রায় স্পৃষ্টের (plosive-like-affricates) চেয়ে যথারীতি

স্পৃষ্টধ্বনিরূপে প্রতিভাত হয়েছে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েণ্টাল এবং আফ্‌রিকান ষ্টাডিজের ধ্বনি ও ভাষাতত্ত্ব বিভাগের গবেষণাগারে নকল তালুর সাহায্যে পরীক্ষা করে আমার এ বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে যে চলিত বাংলার 'চ' বর্গীয় ধ্বনি-গুলো স্পর্শ-তথা স্পৃষ্ট (plosive sounds) ধ্বনিই।

অর্থাৎ 'চ' এর উচ্চারণে জিভের ডগার পেছনের দিক তথা জিভের পাতাকে তালুর অগ্র এবং পশ্চাৎ দন্তমুলের সংগে প্রশস্তভাবে সংযুক্ত ক'রে ক্ষণকালের জন্য ফুসফুস চালিত বাতাসের গতিপথ রুদ্ধ করা হয়। পরস্পরের এ সংযোগ দ্রুত বিচ্ছিন্ন হওয়ার সংগেই ফট্ ক'রে বাতাস বের হ'য়ে যায়—স্বরতন্ত্রীতে লাগেনা কোন কাঁপন, বাতাসের গতিও অবশ্য প্রবল হয়না, ফলে যে ধ্বনি উত্থিত হয় তাকে প্রশস্ত দন্তমূলীয় অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি (dorso-alveolar (বা palato-alveolar) Voiceless unaspirated plosive sound) বলতে পারি এবং ইণ্টারন্যাশন্যাল ফোনেটিক স্ক্রিপ্টের 'c' প্রতীকটির সাহায্যে এ ধ্বনিটিকে চিহ্নিত করতে পারি।

চল্‌তি কথ্যভাষায় 'ছ' ধ্বনিও 'চ' এর স্থান থেকে এবং 'চ' এর মতোই উচ্চারিত হয়, তবে 'ছ' উচ্চারণের বেলা উচ্চারকদ্বয়ের যুক্ত অবস্থা থেকে মুক্ত হবার সময় তাদের পেছনে আঁটকানো একঝলক বাতাস দ্রুত বের হয়ে যায়; অর্থাৎ 'ছ' পৃথক হয় 'চ' থেকে তার মহাপ্রাণতা গুণের জন্য। 'ছ' উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীতে কাঁপন লাগেনা। সুতরাং 'ছ' এর ধ্বনিগত নামকরণ করা যেতে পারে (dorso বা palato-alveolar voiceless aspirated sound) প্রশস্ত দন্তমূলীয় অঘোষ মহাপ্রাণ স্পর্শ-ধ্বনি। এবং ইণ্টারন্যাশন্যাল ফোনেটিক স্ক্রিপ্টের 'ch' প্রতীকটির সাহায্যে এ ধ্বনিটিকে চিহ্নিত করতে পারি।

চলতি কথ্যভাষায় 'জ' এর উচ্চারণও 'চ' এর স্থান থেকে এবং রীতির দিক থেকেও 'চ' এর মতোই; তবে পার্থক্যের মধ্যে এই যে, 'জ' উচ্চারণে স্বরতন্ত্রী কেঁপে যায়, ফলে ধ্বনিটি হয় নিনাদিত। অন্য কথায় 'জ' ঘোষধ্বনি। এর ধ্বনিগত নাম (dorso বা palato-alveolar voiced unaspirated sound) প্রশস্ত দন্ত-মুলীয় অল্পপ্রাণ ঘোষস্পর্শধ্বনি। ইণ্টারন্যাশন্যাল ফোনেটিক স্ক্রিপ্টের dz প্রতীক দিয়ে একে চিহ্নিত করতে পারি।

'ঝ' এর উচ্চারণও 'চ' এর স্থান থেকে। বর্গের অন্যান্য ধ্বনির সংগে এর পার্থক্য

এর উচ্চারণ সময়ে বাতাস বেরোনোর বেগ হয় বেশী এবং স্বরতন্ত্রীও হয় প্রকম্পিত। সেজন্যে 'ঝ' যেমন ঘোষ তেমনি মহাপ্রাণ। এর ধ্বনিগত নাম (dorso বা palato alveolar voiced aspirate sound) প্রশস্ত দন্তমূলীয় মহাপ্রাণ ঘোষ স্পর্শধ্বনি।

উচ্চারণ রীতি এবং ধ্বনি গুণের দিক থেকে 'ক' এবং 'খ' এর মধ্যে যে পার্থক্য 'চ' এবং 'ছ' এর মধ্যেও তাই। অর্থাৎ 'চ' এবং 'ছ' এর মধ্যে অঘোষতা সমানই কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রচিত হয়েছে স্বল্প প্রাণতা এবং মহাপ্রাণতা দিয়ে। আবার 'খ' এবং 'গ' এর মধ্যে কিংবা 'গ' এবং 'ঘ' এর মধ্যে যে পার্থক্য 'ছ' এবং 'জ' এর মধ্যে কিংবা 'জ' এবং 'ঝ' এর মধ্যেও রয়েছে তা-ই। ধ্বনি উচ্চারণের স্থানের দিক থেকে 'চ' 'ছ' 'জ' এবং 'ঝ' এর মধ্যে যে ঐক্য বা সমন্বয়, রীতি এবং ধ্বনি গুণের দিক থেকে স্বল্পপ্রাণতা ও মহাপ্রাণতা, অঘোষতা একং ঘোষতা তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই তেমনি রচনা করেছে পার্থক্য। 'ক' বর্গীয় ধ্বনির মতো এখানে তাই দেখি bundle of corelations এবং opposition counters এ ধ্বনিগুলোকে এককই সংগে এক হারে গেঁথেছে আবার প্রতেকটি থেকে প্রত্যেকটিকে পৃথক ক'রে দিয়েছে। এ মন্তব্য যে কত সত্য তা 'কোল' 'খোল' 'গোল' ও 'ঘোল' শব্দ চতুষ্টয়ের মতো 'আল্' শব্দের পূর্বে 'চ' বর্গের চারটির ধ্বনির বৈশিষ্ট্য সূচক চারটি গুণ সংযোগ ক'রে চারবার উচ্চারণ করলে দেখা যাবে যে একটি অক্ষর-জ্ঞানশূন্য মূর্খ·মানুষ—

চাল্
ছাল্
জাল্
ঝাল্

এ চারটি শব্দ ব'লে বা শুনে চারভাবে সাড়া দিচ্ছে। কারণ এদের এক একটির ধ্বনির এক একটি গুণই তার কানের ভিতর দিয়ে মস্তিষ্ক হ'য়ে মরমে পৌঁছে এক এক রকমের ভাবানুষঙ্গের সৃষ্টি করেছে!

চ বর্গীয় ঘৃষ্ট ধ্বনি

ব্যক্তিবিশেষের মুখে এবং অঞ্চল বিশেষে 'চ' 'ছ' 'জ' এবং 'ঝ' এ ধ্বনিগুলো উচ্চারণ স্থানের দিক থেকে প্রশস্ত দন্তমূলীয় হওয়া সত্ত্বেও রীতির দিক থেকে স্পর্শ

না হয়ে ঘৃষ্ট বা ঘর্ষনজাত এমনকি নিছক শিসজাত ধ্বনিরূপেও উচ্চারিত হ'তে পারে। 'চ' 'ছ' 'জ' এবং 'ঝ' এর শিসজাত (fricative) উচ্চারণ পূর্ব-বাংলার অঞ্চল বিশেষে কখনও কখনও শোনা যায় কিন্তু এদের ঘর্ষনজাত উচ্চারণও নিতান্ত কম শোনা যায় না। 'চ', 'ছ', 'জ', 'ঝ' উচ্চারণ রীতি অনুসারে স্পৃষ্ট না ঘৃষ্ট তা নির্ভর করে এ গুলোর উচ্চারণের সময়ে বক্তার উচ্চারক অংশ দুইটি (অর্থাৎ জিবের পাতা ডগা-সংলগ্ন পাতা উপরের মাড়ির তথা দন্তমূলের সংগে যেভাবে সংযোগ সাধন করেছে) তার পেছনের ফুসফুসাগত বাতাসের চাপে কিভাবে মুক্ত হচ্ছে তার ওপর। যদি উচ্চারক অংশ দুইটির যুক্তাবস্থা পেছনের বাতাসের চাপে দ্রুত আল্‌গা হয়ে যায় এবং সেভাবে উদ্রিক্ত ধ্বনিটি নিতান্ত স্বচ্ছভাবে শ্রুত হয় তা হ'লে তা স্পর্শ ধ্বনি কিন্তু পেছনের বাতাসের ধাক্কায় একেবারে আলগা না হয়ে উচ্চারক দুইটি যদি অপেক্ষাকৃত ধীরে আলগা হয় এবং আলগা হবার সময়ে বাতাসকে যদি একটু চাপা দিয়ে দেয় তা হ'লে যে ধ্বনিটি উচ্চারিত হয় তা স্পর্শ ধ্বনির মতো স্বচ্ছ নয়; অন্য কথায় ধ্বনি গঠন এবং উচ্চারক অংশ দু'টির যোগ সাধন এবং পৃথক করণের দিক থেকে এরাও একরকম স্পর্শ-ধ্বনিই তবে উচ্চারক দুইটির আলগা হবার সময়ে উত্থিত ধ্বনিটির এ সামান্যতম অস্পষ্টতাই স্পর্শ 'চ', 'ছ', 'জ' এবং 'ঝ', এর তুলনায় এদের পার্থক্য রচনা করে। এ ভাবে উচ্চারিত 'চ', 'ছ', 'জ', 'ঝ' কেই ঘৃষ্ট ধ্বনি বলা যায় এবং চিহ্নিত করা যায় যথাক্রমে 'ts', 'tsh', 'dz' এবং 'dzh' এর সাহায্য। এ রকম অবস্থায় 'চ' (ts) এর ধ্বনিগত নাম হয় প্রশস্ত দন্তমূলীয় অঘোষ অল্পপ্রাণ ঘৃষ্ট (dorso-alveolar unvoiced and unaspirated affricate sound), 'ছ' (tsh)এর প্রশস্ত দন্তমূলীয় অঘোষ মহাপ্রাণ ঘৃষ্টধ্বনি (dorso-alveolar unvoiced aspirated affricate sound), 'জ' (dz) এর প্রশস্ত দন্তমূলীয় ঘোষ অল্পপ্রাণ ঘৃষ্টধ্বনি (dorso-alveolar voiced unaspirated affricate sound) এবং 'ঝ' (dzh) এর নাম হয় প্রশস্ত দন্তমূলীয় ঘোষ মহাপ্রাণ ঘৃষ্টধ্বনি (dorso-alveolar voiced aspiratcd affricate sound)।

ইংরেজীতে স্পৃষ্ট কি ঘৃষ্ট কোনভাবেরই মহাপ্রাণ 'ছ' এবং 'ঝ' ধ্বনি দুটোর অস্তিত্ব নেই কিন্তু ইংরেজীর church এইং jail শব্দ দুটির 'চ' (ts) এবং 'জ' (dz)

ধ্বনি দু'টি যথাক্রমে ঘৃষ্ট (affricate) ধ্বনি। ঢাকার কুট্টিদের মুখে 'চ', 'ছ', 'জ', এবং 'ঝ' ধ্বনি গুলো ঘৃষ্ট রূপে উচ্চারিত হয় এবং তা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায় তাদের 'চাকর', চাচ্চা, চাক্কা, জাইলা, ঝাল' প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণে।

পূর্ব বাংলার কোন কোন অঞ্চলে 'চ', 'ছ', 'জ', এবং 'ঝ' ধ্বনি চারটি স্পৃষ্টও নয় ঘৃষ্টও নয়; রীতিমত শিসধ্বনি (fricative) রূপে উচ্চারিত হয়। সে রকম ক্ষেত্রে এদের উচ্চারক অংশ দু'টো সংযুক্ত হ'য়ে ফুস্ফুস্–চালিত বাতাসের পথ কিছুক্ষণের জন্যও রুদ্ধ করে না। উচ্চারক দু'টো সংযুক্তও হয় না, জিভের ডগাসংলগ্ন পাতা দন্তমূলের দিকে উত্তোলিত হয়ে বায়ুপথ এমনভাবে সংকীর্ণ ক'রে দেয় যে বাতাসের গায়ে ঘষা লেগে এধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয়; ফলে 'চাচা' শব্দের উচ্চারণ প্রতিভাত হয় 'সাসা' রূপে, 'ছাওয়াল' শব্দ 'সাওয়াল' রূপে উচ্চারিত হ'তে শুনি, 'জানতে' শুনি 'z'নতে ধরণের, আর 'ঝাল' তখন জিভে মুখে লাগে না, কানে এসে ধাক্কা দেয় 'zh'াল' হিসেবে। এ রকম ক্ষেত্রে উচ্চারণ স্থানের প্রশস্ত দন্তমূলীয় (dorso-alveolar) নাম ঠিক রেখে 'চ'কে অঘোষ অল্পপ্রাণ শিস বা উষ্মধ্বনি, 'ছ'কে অঘোষ মহাপ্রাণ শিসধ্বনি, 'জ'কে ঘোষ অল্পপ্রাণ শিসধ্বনি এবং 'ঝ'কে ঘোষ মহাপ্রাণ শিসধ্বনি নাম করতে পারি।

বিচিত্র উপভাষার 'নানারঙ্গে' ভরা উচ্চারণের দেশ এ বাংলায় 'চ', 'ছ', 'জ' এবং 'ঝ' হরফগুলো একটা সমস্যারই সৃষ্টি করেছে। ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাবে প্রচলিত কথ্য উপভাষায় এগুলো স্পর্শধ্বনিই, ঢাকার সহর অঞ্চলে এগুলো ঘৃষ্ট এবং পূর্ব বাংলার অঞ্চল বিশেষে এরা শিসধ্বনিই। এরকম ক্ষেত্রে কোন তথা-কথিত ধ্বনিবিদ এদের transcription এর প্রশ্ন তুলে যদি বলেন 'চ' প্রভৃতি ধ্বনির জন্য ইণ্টারন্যাশন্যাল ফোনেটিক এ্যাসোসিয়েশান যে চিহ্ন নির্ধারিত করে দিয়েছে অর্থাৎ ইংরেজীর 'চার্চ', (tse: ts, tSs: tS) 'জাজ (dzadz) প্রভৃতি শব্দ লিখিত যে প্রতীক ব্যবহার করা হয় বাংলার জন্যও সর্বত্র সেগুলোই প্রযোজ্য তাহলে তিনি ভুল করবেন। ধ্বনি বিজ্ঞানের সংগে যাঁদের যথার্থ পরিচয় আছে তাঁদের কাছে ধ্বনির অক্ষর বা প্রতীক বড়ো নয়, ধ্বনিই সর্বেসর্বা, তাঁদের মতে যে কোন প্রতীকের সাহায্যেই যে কোন ধ্বনির প্রতিলিপি নির্মাণ করা যায় তবে সুবিধা অসুবিধার কথা ভেবে তাঁরা তা করেন না। প্রাচীন সংস্কার এবং অক্ষরের ঐতিহাসিক মুল্যকেই বড় স্থান দিয়ে থাকেন।

বাংলাতে আলোচ্য ধ্বনিগুলোর উচ্চারণ যে ভাবেই করিনা কেন, লিখবার একটি মাত্র পদ্ধতিই রয়েছে। যেখানে যে ভাবে উচ্চারিত হয় একই পদ্ধতিতে লিখিত হওয়ার জন্যে সেখানকার লোকের কোন অসুবিধা হয়না কারণ এ ধ্বনিগুলো যাদের কাছে স্পর্শ তাদের কাছে স্পর্শই, ঘৃষ্টভাবে যেখানে উচ্চারিত হয়, সেখানে ঘৃষ্টই এবং শিসধ্বনিওয়ালাদের কাছে শিসধ্বনিই কিন্তু দেশের সমস্ত অঞ্চলের লোকদের এতেই হয় অসুবিধা। কারণ আমার কাছে 'চ' 'ছ' 'জ' এবং 'ঝ' হরফগুলোর ধ্বনিগত মূল্য স্পৃষ্ট, ঢাকার কুট্টীদের কাছে (এদের মূল্য) ঘৃষ্ট। ঢাকার প্রান্তবর্তী নোয়াখালী কি চট্টগ্রামের লোকের কাছে এদের মূল্য শিসজাত। ওদের এ ধ্বনির উচ্চারণে আমি যেমন হাসি কি মনে মনে ব্যাঙ্গ করি আমারটা শুনে ওরাও হয়তো তেমনি করে। বাংলার এ ধ্বনিগুলোর রীতি মাফিক আলাদা আলাদা প্রতিলিপি করণ সহজসাধ্য নয় কেননা আমাদের হরফসংখ্যা তাতে ফেঁপে উঠবে, কিন্তু ইণ্টারন্যাশন্যাল ফোনেটিক স্ক্রিপ্ট্ কিংবা তার অনুসরণে রোমানে-যেখানে প্রত্যেকটি ধ্বনির জন্যেই এক একটি প্রতীক রয়েছে সেখানে এ ধ্বনিগুলোর প্রতিবিম্বিত করণ আদৌ কঠিণ নয়। এ ব্যবস্থায় কোন ধ্বনিকেই একটি নির্দিষ্ট হরফে বেঁধে রাখা যায়না, প্রত্যেকটি ধ্বনির জন্য যে নির্দিষ্ট হরফ আছে ধ্বনি তার স্বরূপে এবং স্বীয় প্রকৃতিতে ধ্বনিবিদদের কানে যথারীতি মূর্ত হয়ে উঠ্লেই তাকে তার নির্দিষ্ট হরফ দিয়ে চিহ্নিত করা চলে। এর জন্যে প্রয়োজন ধ্বনিটা কি তা কানে যথাযথ ধরে' মস্তিষ্কে উপলব্ধি করা। 'চ' বর্গীয় ধ্বনি যদি স্পর্শ প্রতিপন্ন হয় তা হ'লে যথাক্রমে c, ch, j এবং jh, রূপে লেখা যেতে পারে, যদি ঘৃষ্ট হয় তা হ'লে ts, tsh, dz এবং dzh রূপে চিহ্নিত করা যায় কিন্তু শিসজাত হ'লে কি করা যেতে পারে? সে রকম হলে 'চ' কে 'ṣ' দিয়ে, 'ছ' কে $\underline{\dot{c}h}$ দিয়ে 'জ' কে 'ẓ' দিয়ে এবং 'ঝ' কে ẓh দিয়ে লেখার প্রস্তাব করি।

(অসম্পূর্ণ)

——o——